সম্পাদকীয়

বাংলাদেশি চলচ্চিত্র শিল্প নিকট ইতিহাসের সবচেয়ে দুর্যোগ-বিষাদময় সময় পার করছে। এ সময়ে দেশি চলচ্চিত্রের একমাত্র অনলাইন ডেটাবেজ বাংলা মুভি ডেটাবেজ (বিএমডিবি)-র উদ্যোগে প্রথমবারের মতো ঈদ সংখ্যা ই-বুক প্রকাশ করা মোটেও তৃপ্তিদায়ক ঘটনা নয়। আমরা চেয়েছিলাম, ঈদের ছুটিকে আরো আনন্দময় করে তুলতে দেশিয় বিনোদন আঙ্গিনা বিশেষতঃ চলচ্চিত্র সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্যবহুল আকর্ষণীয় লেখাসমৃদ্ধ একটি ই-বুক প্রকাশের জন্য। আর এ কারণেই– এই দূর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতি সত্ত্বেও আপনাদের হাতে বিএমডিবি ঈদ সংখ্যা ই-বুক ২০১৭ তুলে দিলাম।

অন্য আর সকল ব্যবসার মতোই চলচ্চিত্র নির্মাণ ও প্রদর্শন একটি ব্যবসা। এর বাজারের ক্রমবিস্তৃতিই এই ব্যবসাকে সম্প্রসারিত ও দীর্ঘায়ু করে। পাশ্ববর্তী দেশ ভারত তার চলচ্চিত্রের বাজার বিস্তৃতির জন্য সবসময়ই সচেষ্ট ছিল। দুঃখজনক, চলচ্চিত্রের কাহিনি থেকে শুরু করে আর্থ-সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারতকে অনুসরণে আমাদের বিপুল আগ্রহ থাকলেও বাংলাদেশি চলচ্চিত্রের বাজার সংরক্ষণ ও বৃদ্ধিতে এর নীতি-নির্ধারকদের আগ্রহ কখনোই লক্ষ্যনীয় হয়নি। বিশাল বাজেটে উন্নতমানের চলচ্চিত্র নির্মাণকারী দেশ চীন তার বাজারে বছরে মাত্র ৩৪টি বিদেশি চলচ্চিত্র প্রদর্শনের সুযোগ দিয়ে একই সাথে তার বাজার রক্ষা ও সম্প্রসারণের সুযোগ তৈরি করে যাচ্ছে এই ২০১৭ সালেও, অথচ আমরা চলচ্চিত্র শিল্পের দুরাবস্থায় ঈদের ছুটিতে মূল ব্যবসা করার সুযোগ দিচ্ছি ভারতীয় ছবিকে। অদূর ভবিষ্যতে ঈদের সময়ে এ দেশে ভারতীয় হিন্দি চলচ্চিত্র মুক্তি পাবে– এই ভবিষ্যদ্বাণী করতে খুব বেশি চিন্তা করার প্রয়োজন হয় না। সব মিলিয়ে বাংলাদেশি চলচ্চিত্র শিল্পের জন্য ২০১৭ একটি কালো বছর হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

ঈদ সংখ্যা ই-বুকটি আমরা সাজিয়েছি বিবিধ বিষয়ে মাত্র দশজন লেখকের প্রবন্ধ দিয়ে। তারা কেউ বিখ্যাত লেখক বা গবেষক নন। তবে সবাই বাংলাদেশি চলচ্চিত্রপ্রেমী এবং বাংলা চলচ্চিত্রের নিয়মিত দর্শক। স্বল্প সময়ে ই-বুকের জন্য লেখা জমা দেওয়ায় তাদের প্রতি আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

তাড়াহুড়ো করে ঈদ সংখ্যা প্রকাশ করতে গিয়ে এর নকশা ও বিন্যাসে আরো সময় ব্যয় করার সুযোগ হয়ে উঠেনি, এজন্য পাঠকের কাছে আমাদের আন্তরিক ক্ষমাপ্রার্থনা। এছাড়া সম্পাদনাগত কিছু অপূর্ণতা রয়েই গেল। ভবিষ্যতে বিএমডিবি ঈদ সংখ্যা ই-বুক প্রকাশে আরো মনযোগী হওয়ার প্রতিশ্রুতি প্রদান করছি।

বিএমডিবি-র ঈদ সংখ্যা ই-বুক ২০১৭ যদি আপনাকে সামান্য পরিমাণ বিনোদিত এবং আলোকিত করতে সক্ষম হয় তবেই আমাদের পরিশ্রম সার্থক হবে। বিএমডিবি ঈদ সংখ্যা পড়ুন, মন্তব্য করুন এবং আরো পাঠকের কাছে ছড়িয়ে দিন।

আপনার ঈদ হোক বাংলাদেশি বিনোদনময়। ঈদ মোবারক!

সূচীপত্র

জহির রায়হানের না বানানো সিনেমাগুলো - নাবীল অনুসূর্য পৃষ্ঠা ০৩

ফর্মুলার সিনেমা, সিনেমার ফর্মুলা - সৈয়দ নাজমুস সাকিব পৃষ্ঠা ০৮

ইশতিয়াক জিকোর সিনেমা ও বাইক্কা আলাপ - নাজমুল হক নাঈম পৃষ্ঠা ১৩

চলচ্চিত্রে সাহিত্য, আলোচিত ১৫ - হৃদয় সাহা পৃষ্ঠা ২৭

যৌথ প্রযোজনা : এক ফেনসিডিলের নাম - আবদুল্লাহ আল-মানী পৃষ্ঠা ৩০

ঈদের সিনেমা খুঁজতে গিয়ে কলকাতা ঘুরে এলাম - রোদেলা নীলা পৃষ্ঠা ৩৪

বাংলা চলচ্চিত্রের প্রচারণা-পরিবেশনা ও প্রেক্ষাগৃহ সংকট - মাহবুবুল হক ওয়াকিম পৃষ্ঠা ৩৭

কলকাতার ইন্ডাস্ট্রি বাঁচাতে সাফটা ও যৌথ প্রযোজনা - মুমতাহিন হাবিব পৃষ্ঠা ৪২

অশ্লীল যুগ : এড়িয়ে যাওয়া যাবে, অস্বীকার করা যাবে না - জুবায়েদ দ্বীপ পৃষ্ঠা ৪৬

ফায়ারফ্লাইজ মানেই কি অসফল পরিণতি? - আল মাহফুজ পৃষ্ঠা ৫৪

ফিল্মস্কুলের অভিজ্ঞতা - বিদ্রোহী দীপন পৃষ্ঠা ৫৫

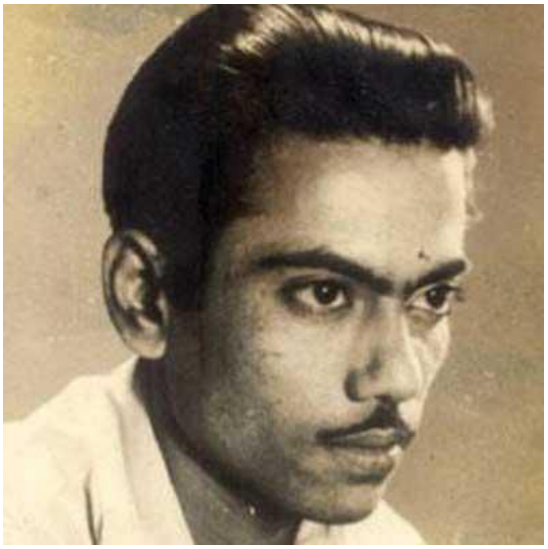

জহির রায়হানের না বানানো সিনেমাগুলো

নাবীল অনুসূর্য

জহির রায়হান। ঢাকাই চলচ্চিত্রের সবচেয়ে সৃষ্টিশীল পরিচালক। যার প্রতিটা চলচ্চিত্রই সৃষ্টিশীলতার উজ্জ্বল স্মারক। ১৯৬১ সালে যখন প্রথম চলচ্চিত্র বানালেন, তখনো তিনি চলচ্চিত্র জগতে তরুণ তো বটেই, ঢাকার চলচ্চিত্রও কেবলই যাত্রা শুরু করেছে। এরই মধ্যে তিনি এক শিল্পীর মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বকে বিষয়বস্তু করে কখনো আসেনি-র মতো নিরীক্ষাধর্মী একটি চলচ্চিত্র বানিয়ে বসলেন।

তার প্রতিটি চলচ্চিত্রই এরকম— কোনো না কোনো সৃষ্টিশীল পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্বাক্ষর বহন করছে। ১৯৬৪ সালে জহির রায়হান যখন ঢাকায় বসে সম্পূর্ণ রঙিন চলচ্চিত্র সঙ্গম নির্মাণ করছেন, তখনো পাকিস্তানের দুই পুরনো ইন্ডাস্ট্রি লাহোর-করাচির কেউ-ই সম্পূর্ণ রঙিন চলচ্চিত্র নির্মাণের সাহস দেখায়নি। রূপবান-এর (১৯৬৫) পর ঢাকায় যখন যাত্রাপালা ও ফোক-ফ্যান্টাসি ভিত্তিক চলচ্চিত্রের জোয়ার বয়ে যাচ্ছে, সে ধারায় তিনি বানালেন বেহুলা (১৯৬৬)। এই বেহুলার গল্প যতটা না সাপের দেবী মনসার গল্প, তারচেয়ে বেশি দেবীর বিরুদ্ধে রক্ত-মাংসের মানুষের সংগ্রামের গল্প, চাঁদ সওদাগর ও বেহুলার গল্প। আর জীবন থেকে নেয়া (১৯৭০) তো বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধেরই এক পূর্বপাঠ, মুক্তিযুদ্ধের অবিচ্ছেদ্য অংশ। বাংলাদেশের ইতিহাসে এমন চলচ্চিত্র আর কখনো নির্মিত হয়নি, হবে কিনা সেও এক গুরুতর প্রশ্ন।

জহির রায়হান চলচ্চিত্র নির্মাণে কেবল সৃষ্টিশীলই ছিলেন না, ভীষণ কৌশলীও ছিলেন। কোনো চলচ্চিত্রের কাজ শুরুর আগে মাথার মধ্যেই পুরো চলচ্চিত্র তৈরি করে ফেলতেন।

তাই চিত্রনাট্যে প্রায়ই তেমন একটা ডিটেইলস থাকত না। আর পুরোটা শেষও করে ফেলতে পারতেন খুবই দ্রুত। অনেক সময় মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই।
সোজা বাংলায়, জহির রায়হানের মাথা ছিল যাকে বলে ‘পরিকল্পনার আস্ত একটা কারখানা।’ একের পর এক পরিকল্পনা খেলে যেত মাথায়।

পরের দিকে তিনি নিজে আর সেগুলো লিখে রাখার ফুরসত পেতেন না। কোনো চলচ্চিত্রের ভাবনা এলো— সহকারীদের ডেকে কাহিনি মুখে মুখে শুনিয়ে দিতেন। তারাই সেগুলো লিখত।

তো, যার মাথা এমন পরিকল্পনার উর্বর কারখানা, সেখানে যে অবিরাম চলচ্চিত্রের পরিকল্পনা আসতে থাকবে, তাতে আর আশ্চর্যের কী! বাস্তবেও হয়েছে তেমনটাই। তিনি যতগুলো চলচ্চিত্র বানিয়েছেন, পরিকল্পনা করেও বানাতে পারেননি প্রায় দ্বিগুণ চলচ্চিত্র। জহির রায়হান দশ বছরের সংক্ষিপ্ত পরিচালক-জীবনে বানাতে পেরেছেন মাত্র এগারটি চলচ্চিত্র। এর মধ্যে দুটো ডকুমেন্টারি— মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বানানো। বাকি ৯টি পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের মধ্যে একটি আবার যৌথ পরিচালনা (সোনার কাজল)। এর বাইরে অবশ্য বেশ কিছু চলচ্চিত্র প্রযোজনা করেছেন। সেগুলোর কয়েকটি আবার নির্মিত হয়েছে তার সরাসরি তত্ত্বাবধানে। আর পরিচালনায় আসার আগে চারটি চলচ্চিত্রে কাজ করেছেন সহকারী হিসেবে। সে সব হিসেবে নিলে তবেই তার নির্মিত চলচ্চিত্রের সংখ্যা পরিকল্পিত কিন্তু অনির্মিত চলচ্চিত্রের সংখ্যাকে ছাড়াতে পারে।

তার চলচ্চিত্র জগতে আগমন ঘটে এ জে কারদারের জাগো হুয়া সাভেরা দিয়ে। ১৯৫৭ সালে চলচ্চিত্রটির সহকারী পরিচালক হিসেবে নাম লেখান সে সময়ের প্রতিশ্রুতিশীল লেখক-সাংবাদিক জহির রায়হান। চলচ্চিত্রটি দেশে মুক্তি পায় ১৯৫৯ সালের মে মাসে। এর মধ্যেই তিনি চলচ্চিত্র নির্মাণের পরিকল্পনা শুরু করেন। সুভাষ দত্তের সাথে মিলে মাহুত নামের একটি চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্যও তৈরি করে ফেলেন। সে জন্য তারা বেশ কিছু স্কেচও আঁকেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত চলচ্চিত্রটি আর বানানো হয়নি।

১৯৬১ সালের নভেম্বরে মুক্তি পায় জহির রায়হানের প্রথম চলচ্চিত্র কখনো আসেনি। সে বছরেরই জুনে ঘোষণা দেন, কলিম শরাফীর সাথে যৌথভাবে নির্মাণ করবেন সোনার কাজল। এটি মুক্তি পায় পরের বছর জুনে। মাঝে ১৯৬২-র শুরুতে ঘোষণা দেন একটি গান দুটি সুর নামের চলচ্চিত্র নির্মাণের। কিন্তু এটি না বানিয়ে শুরু করেন কাঁচের দেয়াল। এর মধ্যে এক নজর দো আঁখে নামে উর্দু চলচ্চিত্র নির্মাণেরও ঘোষণা দেন। একই বছরে বাবুল চৌধুরী ঘোষণা দেন — জহির রায়হানের কাহিনি নিয়ে হরতনের সাহেব ও ইস্কাবনের বিবি নামে একটি চলচ্চিত্র বানাবেন। এই তিনটি চলচ্চিত্রের কোনোটিই শেষ পর্যন্ত নির্মিত হয়নি।

৯৬৪ সালের এপ্রিলে মুক্তি পায় জহির রায়হান পরিচালিত পাকিস্তানের প্রথম সম্পূর্ণ রঙিন চলচ্চিত্র সঙ্গম। এর পরপরই তিনি মিস টিটি নামে চলচ্চিত্র নির্মাণের ঘোষণা দেন। কিন্তু বানানো শুরু করেন পাকিস্তানের প্রথম সিনেমাস্কোপ চলচ্চিত্র বাহানা। সঙ্গম-এর মতো এটিও বানান উর্দু ভাষায়, নির্মাণে খরচ বেশি হওয়ায় দুই পাকিস্তানের বাজার ধরার আশায়। বাহানার শুটিং শুরু হয় নভেম্বরে, এফডিসিতে। সেই সময়ে তিনি আরো একটি চলচ্চিত্র নির্মাণের ঘোষণা দেন, নাম সাত সমুন্দর তের নদী। পরে এটিও আর নির্মাণ করা হয়নি।

১৯৬৫ সালে জহির রায়হান প্রথমে এতো আলো এতো নীল নামে বাংলা চলচ্চিত্র নির্মাণের ঘোষণা দেন। সেই সঙ্গে ঘোষণা দেন লেট দেয়ার বি লাইটের। নিরীক্ষামূলক এই আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রটি মোট পাঁচটি ভাষায় নির্মাণের পরিকল্পনা ছিল তার— বাংলা, উর্দু, ইংরেজি, ফরাসি

ও রুশ। তখন নির্মাণ করতে না পারলেও, পরে ১৯৭০ সালে চলচ্চিত্রটির শুটিং প্রায় শেষ করেন। কিন্তু সম্পাদনার কাজ আর করতে পারেননি, তার আগেই মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। এমনিতেই জহির রায়হানের চিত্রনাট্য আর শুটিংয়ে বেশ ফারাক থাকত। আর এই চলচ্চিত্রটির ক্ষেত্রে তিনি চিত্রনাট্য ছাড়াই কাজ করেছিলেন। তাই ফুটেজ থাকলেও, তার অন্তর্ধানের সাথে সাথে চলচ্চিত্রটিরও এক রকম মৃত্যু ঘটে যায়।

সে বছরেরই মে মাসে জহির রায়হান নিজের আরেক ফাল্গুন উপন্যাস অবলম্বনে একুশে ফেব্রুয়ারি নামে চলচ্চিত্র নির্মাণের ঘোষণা দেন। সেটির পরে আর কোনো খবর পাওয়া যায়নি। জুন মাসে প্রিয়তমেষু নামে আরেকটি চলচ্চিত্র নির্মাণের ঘোষণা দেন। এরই মধ্যে সরকার প্রমোদকর বাড়ালে, তার প্রতিবাদে চলচ্চিত্রটি নির্মাণ না করার ঘোষণা দেন। একই বছরে তিনি হাজার বছর ধরে উপন্যাসটি থেকে চলচ্চিত্র নির্মাণেরও উদ্যোগ নেন। এটিও শেষ পর্যন্ত নির্মাণ করতে পারেননি। অবশ্য তার দ্বিতীয় স্ত্রী কোহিনুর আক্তার সুচন্দা ২০০৫ সালে উপন্যাসটি থেকে একই নামে চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন।

পরের বছর জুন মাসে আবারো একুশে ফেব্রুয়ারি নামে চলচ্চিত্র নির্মাণের ঘোষণা দেন। এবার অবশ্য আরেক ফাল্গুন থেকে নয়, চলচ্চিত্রটির জন্য সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি গল্প ভাবেন। গল্পটি শুনিয়ে শিল্পী মুর্তজা বশীরকে চিত্রনাট্য লেখার দায়িত্বও দেন। চিত্রনাট্য রচনার কাজ শেষ হলে, নিয়মমাফিক সেটা জমা দেওয়া হয় এফডিসিতে। চলচ্চিত্রটির জন্য শিল্পী ও কলাকুশলীও ঠিক করেন তিনি। কিন্তু এফডিসি থেকে চলচ্চিত্রটি নির্মাণের অনুমতি দেওয়া হয়নি। এমনকি চিত্রনাট্যটিও আর ফেরত দেওয়া হয়নি। অবশ্য পরে জহির রায়হান ১৯৭০ সালে সমীপেষু পত্রিকার একুশে ফেব্রুয়ারির বিশেষ সংখ্যায় চলচ্চিত্রটির কাহিনি উপন্যাস আকারে প্রকাশ করেন।

১৯৬৬ সালের নভেম্বরে জানা যায়, জহির রায়হানের তত্ত্বাবধানে নীল দর্পণ (দীনবন্ধু মিত্রের বিখ্যাত নাটক) নির্মিত হবে। ডিসেম্বরে তিনি নিজেই ঘোষণা দেন, কাজী নজরুল ইসলামের জীনের বাদশা অবলম্বনে চলচ্চিত্র নির্মাণ করছেন। চিত্রনাট্যও হয়ে গেছে। দুটোর কোনোটিই আলোর মুখ দেখেনি। সে সময়ে লেট দেয়ার বি লাইট বানানোরও ঘোষণা দেন। চলচ্চিত্রটি সে যাত্রায়ও বানাননি। বরং কাজ শুরু করেন আনোয়ারা-র।

রপর থেকে অবশ্য জহির রায়হানের অনির্মিত পরিকল্পিত চলচ্চিত্রের সংখ্যা কমে আসতে থাকে। এর অন্যতম কারণ ১৯৬৭ সালের ডিসেম্বরে জহির রায়হানের নেতৃত্বে গঠিত সিনে ওয়ার্কশপ গোষ্ঠী। এই গোষ্ঠীতে পরিচালক হিসেবে আরো ছিলেন নূরুল হক বাচ্চু, আমজাদ হোসেন, মোস্তফা মেহমুদ ও রহিম নেওয়াজ। আরো ছিলেন দুজন ক্যামেরাম্যান- অরুণ রায় ও এমএ নাসের। ফলে সব চলচ্চিত্র জহির রায়হানের নিজের বানানোর আর প্রয়োজন থাকে না।

১৯৬৯ সালের একুশে ফেব্রুয়ারিতে, শহীদ দিবসের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের দৃশ্য ক্যামেরায় ধারণ করেন জহির রায়হান। জানা যায়, এই দৃশ্যগুলো তিনি ধারণ করেছেন পরের চলচ্চিত্রের জন্য। আরেক ফাল্গুন থেকে আবারো চলচ্চিত্র নির্মাণের কথা জানান। শেষ পর্যন্ত এই চলচ্চিত্রটিও নির্মাণ করতে পারেননি। সম্ভবত তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে তার কাছে ওই চলচ্চিত্রটির চেয়ে জীবন থেকে নেয়া বানানোই জরুরি মনে হয়েছিল।

১৯৭০ সালের ১১ এপ্রিল মুক্তি পায় জীবন থেকে নেয়া। ওই বছরে জহির রায়হান আরো অনেকগুলো চলচ্চিত্র নির্মাণের ঘোষণা দিয়েছিলেন। মে মাসে ঘোষণা করেন প্রেম এসেছিল ও মা নামে দুটো চলচ্চিত্রের। বছরের শেষ দিকে আরো তিনটি চলচ্চিত্র নির্মাণের ঘোষণা দেন- কবি জসীমউদদীনের সোজন বাদিয়ার ঘাট, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের দেবদাস, আর সুন্দরবনের উপকথা নামে আরেকটি রঙিন চলচ্চিত্র। অবশ্য সে সময়ে তার লেট দেয়ার বি লাইট-এর শুটিং চলছিল।

এর কিছুদিন পরেই শুরু হয়ে যায় মুক্তিযুদ্ধ। ১৯৭১ সালের ২১ এপ্রিল বাসা ছাড়েন জহির রায়হান। কুমিল্লা হয়ে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী আগরতলায় চলে যান। সেখানে দেখা হয় বাবুল চৌধুরীর সাথে। তারপর চলে আসেন কলকাতায়। পরিকল্পনা করেন চলচ্চিত্রের মাধ্যমে পাকিস্তানি বর্বরতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরবেন। সে জন্য চারটি প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণের উদ্যোগ নেন। এর মধ্যে দুটো তিনি নিজে নির্মাণ করেন- স্টপ জেনোসাইড ও এ স্টেট ইজ বর্ন। অন্য দুটি পরিচালনা করেন আলমগীর কবির (লিবারেশন ফাইটার্স) ও বাবুল চৌধুরী (ইনোসেন্ট মিলিয়নস)। কলকাতায় অবস্থানকালেই আরেকটি চলচ্চিত্র নির্মাণের পরিকল্পনা করেছিলেন— ধীরে বহে মেঘনা। চলচ্চিত্রটির কাহিনি কাঠামোও দাঁড় করিয়েছিলেন। কিন্তু নির্মাণ করে যেতে পারেননি।

স্বাধীন বাংলাদেশের স্বাধীন চলচ্চিত্র শিল্প নিয়ে তার স্বপ্ন তো ছিলই, অনেক পরিকল্পনাও ছিল। সেই সব পরিকল্পনাও বাস্তবায়ন করে যেতে পারেননি। স্বাধীন দেশের রাজধানী ঢাকায় ফিরে আসতে আসতে ক্যামেরায় ধারণ করে রেখেছিলেন দেশের মানুষের বিজয়োল্লাস। ঢাকায় এসেও পাগলের মতো কাজ করছিলেন। এর মধ্যেই হঠাৎ খবর পান, পরাজয়ের প্রাক্কালে পাকবাহিনী তার ভাই শহীদুল্লাহ কায়সারকে ধরে নিয়ে গেছে। তার আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। এবার জহির রায়হান পাগলের মতো ভাইকে খুঁজতে শুরু করলেন। ৩০ জানুয়ারি একটা অজ্ঞাতনামা ফোন পেয়ে ছুটে গেলেন মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানিদের দোসর বিহারি-রাজাকার অধ্যুষিত মিরপুরে। তখনো সেই অঞ্চল স্বাধীন হয়নি। কাজেই পুলিশ-সেনাবাহিনী মিলে অভিযানে যাওয়া হবে। বারংবার নিষেধ স্বত্ত্বেও একমাত্র সিভিলিয়ান হিসেবে তিনিও গেলেন সেই মিশনে। সেই শেষ যাওয়া। ভাইকে আনতে গিয়ে নিজেই আর ফিরে এলেন না। বিহারি-রাজাকারদের পরিকল্পিত সশস্ত্র হামলার শিকার হয়ে আরো অসংখ্য সেনা ও পুলিশ সদস্যদের সঙ্গে মারা যান জহির রায়হান।

এভাবে আচমকা থেমে যেতে না হলে, আরো কতই-না সৃষ্টিশীল চলচ্চিত্র নির্মাণ করতে পারতেন জহির রায়হান। নিশ্চিতভাবেই স্বাধীন বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্পকে বলিষ্ঠ হাতে নেতৃত্ব দিতেন তিনি। কত কিছুই না হতে পারত তার হাত ধরে। হয়তো পরিকল্পিত কিন্তু অনির্মিত চলচ্চিত্রের এই তালিকাও আরো দীর্ঘ হতো। কারণ, তার মাথা যে ছিল পরিকল্পনার এক উর্বর কারখানা।

নাবীল অনুসূর্য: লেখক ও চলচ্চিত্র গবেষক

ফর্মুলার সিনেমা, সিনেমার ফর্মুলা

সৈয়দ নাজমুস সাকিব

একটি প্রবাদ আছে— 'ঘুরে ফিরি বটের তল'। সহজ বাংলায়— ঘুরে ফিরে বটের তলা, আরো সহজভাবে— ঘুরে ফিরে সেই একই জিনিস। এই প্রবাদটা কার সাথে সবচেয়ে বেশি যায় বলেন তো? চিন্তা করে বেশি কষ্টের দরকার নেই। সম্ভবত বাংলা সিনেমার সাথে।

শুধু বলে দিলেই তো হবে না, কিছু প্রমাণও দরকার। কারণ বাংলা সিনেমার অতি জনপ্রিয় ও গৎবাঁধা একটি সংলাপ— 'আদালত প্রমাণ চায়'। আমাদের ঢাকাইয়া চলচ্চিত্রের কয়েকটি জনপ্রিয় কাঠামো বা ফর্মুলা হলো :

১. সিনেমার শুরুতেই সন্তান হারিয়ে যাওয়া, অন্যের কাছে বড় হওয়া। শেষে কোন একটি চিহ্নের মাধ্যমে (গান বা গলার লকেট) বাবা-মায়ের কাছে আবার ফিরে আসা।

২. ছোটবেলায় ভিলেনের হাতে বাবা-মা খুন হন। সেই খুনের বদলা নিতে সন্তান বড় হতে থাকেন। একসময় বদলা নেন এবং সেই বদলা যতই নৃশংস হোক না কেন, নায়কের যত দোষই থাকুক না কেন — তিনি শেষ দৃশ্যে সমস্ত পাপ মোচন করে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে হাসিমুখে বেরিয়ে আসেন।

৩. গরীব নায়ক বা নায়িকা স্বাবলম্বী হতে শহরে এসে কাজ শুরু করেন। অল্প কিছু সময়ের মাধ্যমে অর্থাৎ মাত্র দুই-তিন মিনিটেই (কয়েকটা জাম্প শটে) তারা সম্পদের মালিক হন। (যদিও এ ক্ষেত্রে নায়িকাদের কম দেখা যায়, নায়কদের বেশি দেখা যায়। এর মানে কি দাঁড়ায়? পরিশ্রম শুধু নায়ক বা পুরুষরাই করেন বা তাদেরই করতে হয়? নারীদের কাজ শুধু ঘরে থাকা?)

৪. নায়ক গুণ্ডা বা সন্ত্রাসী— কিন্তু একই সাথে সৎ ও পরোপকারী। ধনীদের সম্পদ লুট করে গরীবদের মাঝে বিলিয়ে দেন। এই কারণে তার সাত খুন মাফ।

৫. প্রেম। এর আবার অনেক প্রকারভেদ; ধনী-গরিব প্রেম, ত্রিভুজ প্রেম, ভালোবাসার অদৃশ্য শক্তিতে অর্ধমৃত নায়কের নায়িকার সামনে প্রবল শক্তিশালী মানুষ হিসেবে আবির্ভূত হওয়া।

কথা হচ্ছে, এগুলো কেন হচ্ছে? আমাদের কি কাহিনির এত অভাব? শুধু বাজেটের স্বল্পতাই কি এর কারণ? এইসব প্রশ্ন করলে আবার একেকজন একেকজনের কাঁধে দোষ চাপান, যদিও প্রকৃত সত্য হচ্ছে পরিচালক থেকে শুরু করে আমরা দর্শক— সবাই এক সুতায় গাঁথা, আমরা সবাই দোষী।

আচ্ছা, ব্যতিক্রমী কোন কিছুই কি আমাদের দেশে কখনো হয়নি? যেগুলো হয়েছিল সেগুলোর রেজাল্ট বা ফলাফল কি?

৬০-এর দশকে উর্দু সিনেমার বাড়াবাড়ির কারণে ঢাকাই সিনেমা বেশ একটা অস্তিত্ব সঙ্কটের মধ্যে পড়ে। ১৯৬২ সালে মোট ১৬টি সিনেমার মাঝে মাত্র তিনটি ছিল বাংলা, বাকি সব ছিল উর্দু ভাষায়। এক বছরের মাঝে অবস্থার আরো অবনতি ঘটে- প্রায় ৯০% সিনেমা ছিল উর্দু ভাষায় নির্মিত। ১৯৫৬ সালে আব্দুল জব্বার খান সামাজিক ড্রামা আর কিছুটা অ্যাকশন মিলিয়ে মুখ ও মুখোশ নামক যে সিনেমা বানিয়েছিলেন— বাকিরা কেউ সেই কাঠামো থেকে বের হতে পারছিলেন না। আর এদিকে উর্দু সিনেমার দাপট দিন দিন বেড়েই যাচ্ছিল। কিন্তু বাংলা সিনেমার প্রতি দর্শকের চাহিদা আর ভালোবাসা ছিল এখনকার তুলনায় অনেক। এই ভালোবাসাটাই আঁচ করতে পেরেছিলেন নির্মাতা সালাহউদ্দিন। প্রচলিত একটা গল্প নতুন ধরনে বললেন, নাম রূপবান— বাংলা ইন্ডাস্ট্রির প্রথম লোককাহিনীভিত্তিক সিনেমা। গল্পটা এমন— একটি অলৌকিক বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে ১২ বছরের মেয়ের সাথে ১২ দিনের এক নবজাতকের বিয়ে দেওয়া হয়। এরপর শর্তানুযায়ী বিয়ের দিনই তাদের বনবাসে পাঠানো হয়। এরপরে তাদের বেড়ে ওঠা, সম্পর্কের টানাপোড়েন নিয়েই কাহিনি এগিয়ে চলে। ভাবলে অবাক লাগে, আজ থেকে এত বছর আগে এই ধরনের কাহিনির সিনেমা আমাদের দেশেই নির্মিত হয়েছে।

দর্শক যেন লুফে নিল রূপবানকে, ফলাফল রাতারাতি রূপবান একটি সফল চলচ্চিত্র। কিন্তু এই সফলতাই যেন কাল হল, ইন্ডাস্ট্রি লোককাহিনী সিনেমার একটি কাঠামো খুঁজে পেল যেই কাঠামোর আদিতে পাপ, মাঝে ফলভোগ আর শেষে যথারীতি মিলন।

একই কাঠামোতে শুধু গল্পে পরিবর্তন এনে জহির রায়হান ১৯৬৬ সালে নির্মাণ করলেন বেহুলা। দেবীর কথা অমান্য করা মানে পাপ করা, সন্তান হারানোর মধ্য দিয়ে ফলভোগ আর সিনেমার শেষে স্বামীকে ফিরে পাওয়ার মধ্য দিয়ে মিলন। এই একই কাঠামোতে একে একে নির্মাণ হয় রহিম বাদশা ও রূপবান, রাজা সন্ন্যাসী, আবার বনবাসে রূপবান, গুনাই বিবি, মহুয়া, ভাওয়াল সুন্দরী, আপন দুলাল, জরিনা সুন্দরী-র মতো আরো অনেক সিনেমা। আশ্চর্যজনক হলেও সত্য যে এগুলোর কোনটাই রূপবান বা বেহুলা-কে ছাড়াতে পারেনি এবং নির্দিষ্ট গল্পকাঠামো ভেঙ্গে বেরিয়ে আসতে পারেনি।

তবে এই লোককাহিনির মাঝে কিছু সামাজিক ড্রামা আর অ্যাকশন মিলিয়ে ১৯৮৯ সালে তোজাম্মেল হোসেন বকুল বেদের মেয়ে জোসনা নামক বাংলাদেশের অন্যতম ব্যবসাসফল সিনেমা বানান। আজ পর্যন্ত লোককাহিনীভিত্তিক আর কোন সিনেমা এত ব্যবসা করতে পারেনি, একই সাথে এই ধরনের সিনেমা নির্মাণেও ভাটা পড়ে।

৭০ এর দশকটা মূলত ছিল মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সিনেমার। ১৯৭০ সালে জহির রায়হানের হাত ধরে আসে জীবন থেকে নেয়া। রাজনৈতিক টানাপোড়েনের সাথে রূপক অর্থে সামাজিক টানাপোড়েন অসাধারণভাবে তুলে ধরেন জহির রায়হান। যুদ্ধের পরে ১৯৭২ সালে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সিনেমা নির্মাণ শুরু হয় ওরা ১১ জন-এর মাধ্যমে। যে কাঠামো চাষী নজরুল ইসলাম বানিয়েছিলেন এ সিনেমার মাধ্যমে, তার বাইরে বেশিরভাগ পরিচালকেরা যেতে পারেননি। কয়জন পরিচালক মুক্তিযুদ্ধের গ্র্যান্ড

ন্যারেটিভের বাইরে গিয়ে সিনেমা বানাতে পেরেছেন তা প্রশ্নসাপেক্ষ। ধীরে বহে মেঘনা, হাঙ্গর নদী গ্রেনেড, মুক্তির কথা, মুক্তির গান, রাবেয়া, আগুনের পরশমণি, একাত্তরের যীশু, জয়যাত্রা এরপরেও নতুন কাঠামোতে নতুন গল্প বলেছে।

এই সময়ের আরেকটি অন্যরকম সিনেমা হল জহিরুল হকের রংবাজ। এর কাহিনি আমাদের সামাজিক কাঠামোর বিপরীত বলে সমালোচকদের সমালোচনার সম্মুখীন হয়। কিন্তু রংবাজ-কে দর্শক ভালোভাবেই গ্রহণ করে। এতটাই ভালোভাবে যে এরপরে বেশিরভাগ পরিচালক এর মতো সিনেমা বানাতে শুরু করলেন ব্যবসার কারণে। এমনকি রংবাজ-এর মারামারির স্টাইল ঢাকাইয়া সিনেমাতে এখনো অনুকরণ করা হয়! (দুইজন ভিলেনের উপর ভর করে তৃতীয় ভিলেনকে আঘাত করা।)

৮০-র দশকে সিনেমার কাহিনিতে কোন সামঞ্জস্য না থাকায় তা ক্রমাগত দর্শক টানতে ব্যর্থ হতে থাকে। যদিও সামাজিক ঘরানার বেশ কিছু সিনেমা দর্শকনন্দিত হয়।

৯০ দশককে বাংলা সিনেমার নতুন সূচনা বললে খুব একটা বাড়িয়ে বলা হয় না। এইসময়ে বাংলা সিনেমা প্রবেশ করে প্রেমের গল্পে। প্রথমদিকে সবকিছু ঠিকমতো থাকলেও একসময় আবার এক নির্দিষ্ট কাঠামো তৈরি হয়ে যায় যেটির বাইরে বেশিরভাগই যাওয়ার চেষ্টা করেননি। এবার নিম্নরূপ কাঠামো তৈরি হয়—

১. দুই পরিবারের বিরোধ অথচ সেই দুই পরিবারের ছেলে-মেয়ের মাঝে প্রেম। প্রথমে মেনে না নেওয়া এবং শেষে মিলন।
২. ছোটবেলায় খেলার সাথী হারিয়ে যাওয়া, বড় হয়ে নির্দিষ্ট গান বা চিহ্নের মাধ্যমে দেখা হয় অতঃপর সুখে শান্তিতে বসবাস।
৩. ত্রিভুজ প্রেম। এক নায়ক-দুই নায়িকা বা এক নায়িকা-দুই নায়ক। একজনের মৃত্যুর মাধ্যমে বাকি দুইজনের মিলন।

১৯৯১ সালে ভিন্নরকমের একটি গল্পে চাঁদনী নির্মিত হয়, যার পরিচালক এহতেশাম। ইন্ডাস্ট্রিতে তখন নতুন মুখের তীব্র সংকট— এই বিষয়টা অনুধাবন করেই এহতেশাম নতুন মুখকে নিয়ে চাঁদনী নির্মাণ করেন। সিনেমা যতটা ব্যবসাসফল হয়, তারচেয়ে বেশি জনপ্রিয়তা পায় গান। ফলে আবার এক নতুন কাঠামো তৈরি হয়— বানাও প্রেমের সিনেমা। এ সময়ে ভারতের কিছু সিনেমা নকল করে অথবা রিমেক করে সিনেমা নির্মাণও শুরু হয়। তবে নব্বই দশকের সিংহভাগ সিনেমার মূল থিম হচ্ছে প্রেম ও রোমান্স। কেয়ামত থেকে কেয়ামত, স্বজন, স্বপ্নের পৃথিবী, স্বপ্নের নায়ক, প্রেম যুদ্ধ, তুমি আমার-এর মতো সিনেমাগুলো উল্লেখযোগ্য ব্যবসা করে। এই ব্যবসা করা সিনেমাগুলোর মাঝে কোনটিই উপরে উল্লেখিত কাঠামো থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি। তবে যে সিনেমাগুলোর নাম বলা হলো, তার মাঝে বেশিরভাগ সালমান শাহ অভিনীত। এই মানুষটি বিক্ষোভ-এর মতো রাজনৈতিক বক্তব্যধর্মী সিনেমা আবার আনন্দ অশ্রু-র মতো ভিন্ন ধরনের কিছু করার চেষ্টা করেছিলেন। সেগুলোও সফল। তবে সংখ্যাটা অনেক কম।

প্রেমের সিনেমা ক্ষেত্রে নায়ক-নায়িকার ধাক্কা খেয়ে পরিচিত হওয়া, চোখে-চোখ পড়তেই পাহাড়, সমুদ্র, বনে হারিয়ে যাওয়া— এটা যেন বাংলা সিনেমার ক্ষেত্রে একটি স্ট্যান্ডার্ড হয়ে দাঁড়ায়। এটা না থাকলে অনেকের কাছে যেন সিনেমা বস্তুটাই 'সিনেমা' হয়ে উঠত না, এমনকি এখনো অনেকের কাছে হয়ে উঠে না।

নব্বইয়ের শেষেরদিকের অন্যতম ব্যবসাসফল নির্মাণ আম্মাজান। কাজী হায়াতের পরিচালনা আর মান্নার দুর্দান্ত অভিনয়ের জন্য সিনেমাটি আজো সবার মনে আছে। তবে আম্মাজান-এর সাফল্য দেখে আবার সেই ফর্মুলা শুরু হয়। ছোটবেলায় নায়ক বা নায়িকার বাবা-মায়ের সাথে কোন অন্যায় হয়, আর নায়ক বা নায়িকা বড় হয়ে সেই অন্যায়ের প্রতিশোধ নেন। তবে মজার ব্যাপার হলো, সেগুলো কোনটাই আম্মাজান সিনেমা সাফল্যকে ছুঁতে পারেনি। এমনকি খোদ কাজী হায়াৎ আব্বাজান নামে একটি সিনেমা বানিয়ে আগেরটির অর্ধেক সাড়াও ফেলতে পারেননি।

এরপরে অশ্লীলতার মতো বিষধর সাপের আগমন, যার বিষ সম্ভবত এখনো এফডিসির আনাচে কানাচে মিশে আছে। তবে ধ্বংসস্তূপের মাঝে দাঁড়িয়ে যেমন অনেকেই জীবনের গান গেয়ে চলেন, তেমনি এরকম প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও কিছু 'ভালো' সিনেমা তৈরি হয়। এরকম একটি সিনেমা হল বাংলাদেশ-ভারতের যৌথ প্রযোজনায় নির্মিত মনের মাঝে তুমি। তুমুল ব্যবসাসফল এই সিনেমাতে দেখা যায়— ছোটবেলায় নায়ক-নায়িকার প্রেম, এরপরে বিচ্ছেদ, বড় হয়ে নতুন করে পরিচয়, সম্পর্কের ওঠানামা ও দিনশেষে শুভমিলন। এই সিনেমার গানও ব্যাপক জনপ্রিয়। তবে দিনশেষে আবারো সেই একই সমস্যা — এই সিনেমাও উপরে উল্লেখিত কাঠামো থেকে বের হতে পারেনি।

২০১১ সালে প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান জাজ মাল্টিমিডিয়া-সহ আরো বেশ কয়েকজন নতুন পরিচালকদের মাধ্যমে (যাদের মাঝে বেশিরভাগ টিভিপর্দায় কাজ করেছেন) অশ্লীলতার সময় পেরিয়ে আমাদের ঢাকাইয়া সিনেমা নতুন করে তার যাত্রা আরম্ভ করে। কিন্তু সেই নতুন যাত্রা আসলে কতটা নতুন? ওই সময় থেকে বর্তমান পর্যন্ত অন্যতম দুইটি ব্যবসাসফল ও দর্শকনন্দিত সিনেমা হচ্ছে চোরাবালি ও অগ্নি। কিন্তু এই দুটি সিনেমা কি আসলেই নতুন কিছু দিতে পেরেছে? ছোটবেলায় বাবা-মার খুন হওয়া, সন্তানের সন্ত্রাসীতে পরিণত হওয়া, বড় হয়ে সাংবাদিক নায়িকার প্রেমে পড়া, হত্যার বদলা নেয়া এবং শেষে কারাগার থেকে বের হওয়া এই সবের যোগফল হল চোরাবালি। আবার ছোটবেলায় বাবা-মার খুব হওয়া, নায়িকার বড় হওয়া প্রতিশোধের নেশায়, হত্যার বদলা নেওয়া— এ সব হলো অগ্নি। নিরুপায় দর্শক এরপরেও সেই একই কাঠামোর সিনেমা দেখে যাচ্ছেন, নতুন কিছু পাবেন এই আশায়। কিন্তু নতুন কিছুই তারা দিন শেষে পাচ্ছেন না।

তারমানে কি কাঠামোর বাইরে কোন সিনেমাই হচ্ছে না? কারো ক্ষমতা নাই ভিন্ন কিছু করার? নাহ, কথাটা এতটা সত্যি না। ভিন্ন অনেক কিছু হয়েছে। ৫০ দশকের দুর্ভিক্ষ নিয়ে শেখ নিয়ামত আলীর সূর্যদীঘল বাড়ি থেকে শুরু করে মরণের পরে, ক্ষতিপূরণ (বিদেশে কাহিনী অবলম্বনে), লাল সবুজ, হুলিয়া, আগামী, দহন, ঘুড্ডি, চাকা, চিত্রা নদীর পারে, লালসালু, মাটির ময়না, কিত্তনখোলা, স্বপ্নডানায়, থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার, টেলিভিশন, বৃত্তের বাইরে এবং আরো অনেক সিনেমা। কিন্তু এরপরে একটি প্রশ্ন থেকে যায়, যেই কাঠামোতে এইসব সিনেমার পরিচালকেরা গল্প বলেছেন, সেটি আসলে কাদের জন্য? অর্থাৎ কোন শ্রেণীর দর্শকদের জন্য? এর মধ্যে কয়টি সিনেমা প্রচণ্ড পরিমাণে দর্শকনন্দিত হয়েছে? বাংলার যে সব দর্শক সারাদিন কাজ শেষে একটু বিনোদনের আশায় সিনেমা হলে যায়, তাদের কতজনকে এই সব সিনেমার গল্প তুষ্ট করতে পেরেছে? নাকি দর্শককে তুষ্ট করার চেয়ে পুরস্কার প্রাপ্তি বা বিদেশে সম্মাননার দিকে মনোযোগ বেশি? দিনশেষে সিনেমা যদি সাধারণ দর্শকের কাছে না পৌঁছে, তাহলে সেই সিনেমার নির্মাণের আসল উদ্দেশ্য কোথায়? এসব সিনেমার ক্ষেত্রে প্রচারের পরিমাণ এত কম কেন? দর্শক যদি জানতেই না পারে যে একটি ভালো সিনেমা তার বাড়ির পাশের হলে আসছে, তাহলে সে সিনেমা দেখবে কীভাবে?

তবুও মাঝে মাঝে কিছু সিনেমা নির্মিত হয় যা মাস পিপল এবং ক্লাস পিপল দুই শ্রেণীর মানুষকেই হলের সিটে বসিয়ে রাখতে বাধ্য করে, যেমন; মনপুরা বা আয়নাবাজি। কিন্তু সারাজীবন শুধু এ দুই সিনেমার উদাহরণ দিয়ে যাওয়াটা মনে হয় না আমাদের জন্য খুব সুখকর হবে।

মৃত ভেবে বাড়ির চাকরকে দিয়ে নিজের শিশু সন্তানকে কবরে দিতে পাঠান বাবা। এক ডাকাত সর্দার চাকরকে খুন করে শিশুটিকে নিজের কাছে পালন করে। বড় হয়ে শিশুটি হয় ডাকাত। আর সেই বাবা-মার আরেক সন্তান হয় পুলিশ। এরপর ডাকাত-পুলিশের যুদ্ধ (অর্থাৎ দুই আপন ভাইয়ের যুদ্ধ) আর ২০ বছর পর হারানো সন্তানকে ফিরে পাওয়া নিয়ে নির্মিত হলো একটি সিনেমা।

প্রায় ৬০ বছর পরের কথা, বাড়ির চাকর ও চাকরানী টাকার লোভে মালিকের ছোট মেয়েকে চুরি করে পালায়। জঙ্গলে পুলিশের গুলিতে তারা মারা যান, ছোট মেয়েটিকে খুঁজে পায় এক বার ড্যান্সার। মেয়েটিও বড় হয়ে বার ড্যান্সার হয়ে উঠে। সেই মেয়ের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি পড়ে খলনায়কের। ঘটনাচক্রে আসল বাবার পাশের ফ্ল্যাটে কাজের মেয়ে হিসেবে আশ্রয় নেয় মেয়েটি। একপর্যায়ে মেয়েটি ভিলেনের হাতে ধরা পড়ে। এরপর নায়ক-খলনায়কের যুদ্ধ আর বাবা তার হারানো সন্তানকে ফিরে পাওয়া— সিনেমা শেষ।

প্রথম প্যারার কাহিনী বাংলাদেশের প্রথম সিনেমা মুখ ও মুখোশ-এর, আর দ্বিতীয় প্যারার কাহিনী ২০১৪ সালে মুক্তি পাওয়া দবির সাহেবের সংসার-এর। ৬০ বছর আগে প্রযুক্তির সীমাবদ্ধতা আর অর্থের অভাবে অথবা প্রতিকূল পরিবেশে মুখ ও মুখোশ-এর নির্মাণ মেনে নিতে পারলেও, এত বছর পর ২০১৪ সালে প্রায় একই ধরনের সিনেমা নির্মাণ কীভাবে মেনে নিই? আমাদের আজকের চলচ্চিত্র কেন তার আনুষাঙ্গিক সমস্যা কাটিয়ে উঠতে পারছে না? নাকি তাকে কাটিয়ে উঠতে দেওয়া হচ্ছে না? এমন তো না যে আমাদের দর্শকরা সিনেমা ভালোবাসেন না বা একেবারেই হলে যান না। এমনই যদি হত তাহলে অগ্নি, মোস্ট ওয়েলকাম, আয়নাবাজি, শিকারি-র এর মতো সিনেমা নিশ্চয় ভালো ব্যবসা করতো না?

আয়নাবাজি-র দুর্দান্ত সাফল্যের পর অনেকেই নাকি আবার সেই কাঠামোমুখী হওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। ‘জেল পালানো’ কনসেপ্টে সিনেমা বানাতে চেয়েছিলেন। চঞ্চল চৌধুরীর দারুণ অভিনয় দেখে অনেক পরিচালক আবার টিভি অভিনেতাদের নিয়ে কাজ করার ইচ্ছাও প্রকাশ করেছিলেন, যদিও সাধারণত টিভির অভিনেতাদের দিয়ে সিনেমা হয় না— এমনটাই বলে থাকেন তারা মাঝে মাঝেই। অথচ এরকম হওয়ার কথা ছিল না। আয়নাবাজি সফল হলে আমাদের উচিত এ টাইপ আর কিছু না বানানো, একদম ভিন্ন পথে হাঁটা। চঞ্চল কিন্তু তাই করেছেন, হুমায়ূন আহমেদের উপন্যাস দেবী অবলম্বনে নির্মিত সিনেমাতে কাজ করেছেন। অমিতাভ রেজাও রিকশা গার্ল নামের নতুন এক সিনেমার কাজে নেমেছেন, যার কনসেপ্ট আয়নাবাজি থেকে একদম আলাদা। এটাই তো দরকার। বৈচিত্র্য দরকার!

একজন পরিচালক যদি বছরে সাত-আটটি সিনেমা নির্মাণ করেন, একজন অভিনেতা যদি বছরে ছয়-সাতটি সিনেমাতে অভিনয় করেন, তাহলে তাদের কাছ থেকে ভিন্ন কিছু বা নতুন কিছু আশা করাটা মনে হয় বোকামি। একইভাবে একজন গল্প লেখক যদি আট-দশটি সিনেমার গল্প লেখেন বছরে, তাহলে নকল না হয়ে আর কী হবে? এই ধরনের সমস্যা আগে দূর করতে হবে। তাহলেই কাঠামোর ভিতরে থেকে হোক বা কাঠামোর বাইরে গিয়ে হোক— ঢাকাইয়া সিনেমার জয় হবে সর্বত্র।

সৈয়দ নাজমুস সাকিব : অভিনেতা ও লেখক

ইশতিয়াক জিকোর সিনেমা ও বাইক্কা আলাপ

নাজমুল হক নাঈম

ইশতিয়াক জিকো। বাংলাদেশি তরুণ চলচ্চিত্র নির্মাতা, প্রশিক্ষক, প্রযোজক ও সংগঠক। তার পরিচালিত ৭২০ ডিগ্রি ইতালির ভেনিস আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে মনোনীত বাংলাদেশের প্রথম স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র। চলচ্চিত্র ভাষায় নতুনত্বের জন্য ২০১০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের এইচবিও পুরস্কার পান তিনি। সিনেমাটি রট্যারড্যাম, শিকাগোসহ পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্র উৎসবে দেখানো হয়।

সম্প্রতি তিনি তরুণতর চলচ্চিত্র নির্মাতা ও কর্মীদের নিয়ে শুরু করেছেন সংগঠন বিড়ালপাখি সিনে ক্লাব। প্রতি মাসে আয়োজন করে যাচ্ছেন বিড়ালপাখির মজমা। সেখানে জমায়েত হয় সারাদেশের নবীন নির্মাতারা। ইশতিয়াক জিকো সংগঠনটির মাধ্যমে প্রথাগত ফরম্যাটের বাইরে নিরীক্ষাধর্মী চলচ্চিত্র ভাষার অনুশীলন করছেন।

জিকো ঘুরেছেন ও কাজ করেছেন বিশ্বের নানা দেশে। প্রশিক্ষণ দিয়েছেন শ'খানেক নবীন চলচ্চিত্রকর্মীদের। পাশাপাশি তরুণদের নিয়ে নির্মাণ কর্মশালার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন।
বাংলা মুভি ডেটাবেজের পক্ষ থেকে ইশতিয়াক জিকোর মুখোমুখি হয়েছেন স্থপতি-নির্মাতা নাজমুল হক নাঈম। আসুন জেনে নিই কী কথা হলো তাদের—

একটু দায়সারা ভাবে শুরু করি, আছেন কেমন?

ধরেন, রাস্তায় বা ফেসবুকে হাঁটতে গিয়া মহল্লার মুরুব্বি এই প্রশ্নটাই করল। হয়তো বলতাম— ভালো, চলতেছে, আপনার কী খবর? তিনিও একই উত্তর— আছি ভালোই। আইসো বাসায়। তারপর যে যার রাস্তায়। আমরা তো নিত্যবেলা এরকম রিচ্যুয়ালগুলা পালন করি, তাই না? কারণ, এর উল্টা বললেই অস্বস্তি শুরু। দুই পক্ষেই। দ্বিতীয়, তৃতীয়, ক্রমাগত প্রশ্নের দায়ভার নিতে হয়। খারাপ থাকা নিয়া দুঃখপ্রকাশ করতে হয়। দায়সারা থাকাটা দায় হইয়া দাঁড়ায়। ভারসাম্যহীন দশা। তবে 'কেমন আছেন'-এর আনুষ্ঠানিকতার দায় সারলে, কিম্বা কাগজে স্পেস স্বচ্ছলতা থাকলে, আলাপটা বিস্তার করতে পারি আমরা।

বিস্তারের দুই পিঠ পাই। যখন সমকাল কিম্বা সমস্থান নিয়া চেতন থাকি, কী হইতেছে চারপাশে, মাঝে মাঝে খুব আপসেট লাগে। অস্থির লাগে। অস্তিত্বের অর্থহীনতারে যাপন করতে কষ্ট লাগে। কাছের মানুষ দূরের মানুষ সবাইরে দ্বিমাত্রিক তলের বাসিন্দা মনে হয়। অনেক 'কেন' বোধ তাড়া করে। নিজের সঙ্গে, নিজের মনে, ক্ষণে ক্ষণে লড়াই চলে।

অন্য পিঠ, যখন মহাকাল বা মহাস্থানের চেতনা ভর করে। তখন মগ্ন থাকার চেষ্টা করি তুচ্ছ কাজে।

মানে, অকাজে। আকামে। যেই কাজে টাকা, সম্মান বা সাংসারিক উদ্দেশ্য সাধন হয় না, তারেই তো লোকে অকাজ বা আকাম বলে, নাকি? তো, আমি সেই অকাজ করি। এই তুচ্ছতায় বা অকাজে নিবিষ্ট থাকার যে আনন্দ, তার সঙ্গে মনে হয় পলায়নপরতা বোধের তফাৎ আছে। অকাজেও দায় থাকে। পলিটিক্যাল দায়। কিন্তু পালায়া যাওয়ার বোধ বা প্রবৃত্তি যেন পলিটিক্যাল দায়গুলা এড়াইতে চায়। বাঁইচা থাকার লড়াইটাতো পলিটিক্যাল। আমি এমনে দেখি।

সমকালের কথা বলতেছিলাম। ইনস্ট্যান্ট কাল। এর চাপ উতরাইতে পারলে মনে হয়, শান্তিতে আছি। স্বান্তনা পাই এই ভাইবা— আর্থিক অনিশ্চয়তার পথ বাইছা নিছি স্ব-সম্মতিতেই, তার দায়িত্বও আমার। লোকদেখানো সমাজ সেবার আড়ালে মুনাফা বাড়ানোর ফিকির করতেছি না। টাকার কাছে পুরাপুরি না সঁইপাও যে শান্তিতে বাঁইচা থাকা যায়, এইটার জন্য বোধহয় লড়াই করি। তবে এইরকম বাঁচার কিছু কাফফারাও গুণতে হয়। সেইটারে জায়েজ করি গাণিতিক বাস্তবতার মতো। ভাগফলের পর ভাগশেষ অশূন্য হইলে কি তা মাইনা নিই না?

আচ্ছা, আলাপটা খুব ভারি শুনাইলে প্রকাশনার সময় কিছু ইমোটিকন বসায়া নিয়েন। আমরা দিন দিন টাইম-অস্বচ্ছল হইয়া উঠতেছি। যেন এক হাইপারলিংক দোষে। ;-)

পলিটিক্যাল অকাজ বা আকাম করার এই সিদ্ধান্ত নিজের গরজেই নিছেন নিশ্চয়ই। পালাইতে না চাওয়ার কুফল হিসাবেই চেপে বসছে হয়ত ঘাড়ে। :) মুনাফা বাড়ানোর ধান্দায় নামেন নাই, সমকাল ছাইড়া মহাকাল নিয়াও ভাবেন। সেই আপনি আবার একাধারে নির্মাতা, সংগঠক, শিক্ষক। জিকোবাজি নামে লেখালেখি করেন ব্লগে। কোন পরিচয়টি সবচেয়ে পছন্দের?

সব কাজই পছন্দের। এই পছন্দের কোনো চিরন্তন হায়ারার্কি নাই। তবে পরিচয় বলতে মনে হয় বিশেষণ বা তকমাটারে ইঙ্গিত করতেছেন। গায়ে তকমা চাপানোর আগে নিজের কাজকাম নিয়া ভাবা যাক। ধরেন, করতেছিটা কী? পাবলিক স্পেসে কৃতকর্ম বলতে— একটা বড় দৈর্ঘ্যের সিনেমা তৈরির ফাংশনাল প্রস্তুতি নিতেছি। বিড়ালপাখি সিনে ক্লাবের মজমায়-পাঠচক্রে হাজিরা দিতেছি। সুযোগ পাইলে নবীনদের প্রশিক্ষণ দেয়ার নামে নিজেই শিখতেছি। আর ইদানিং ফেসবুকে এইটা ওইটা খুব পোস্ট দিতেছি।

দিনশেষে নিজের সম্মতিতে সম্পাদিত যেইসব ক্রিয়া বা কর্ম 'হোক সেইটা একসিডেন্টাল বা ইনসিডেন্টাল' সেইটা দিয়াই আমি আইডেনটিফাইড হইতে চাই কিনা, সেই প্রশ্নটা কিন্তু উঠতেছে না। দেখেন, কর্ম আর তকমার সেতুটা কত লিনিয়ার আর সিম্পলিফাইড কইরা ফেলছি। যেহেতু সিনেমা পরিচালনা করছি, তাই জিকোরে 'নির্মাতা'র তকমা পড়াও। এই তকমা পড়ানোয়, পড়নে কষ্ট কম। স্টেরিওটাইপিং বেশি। মানে, তকমাঅলা ফোল্ডারে চালান দিলেই যে একটা ফাইল তার নিজের পরিচয় পাবে, তার গ্যারান্টি কী? :)

দ্বিতীয়ত, পরিচয়ের খাতিরে যত তকমা আমি স্বীকার করতে থাকি, তত যেন নিজের ঘাড়ে নতুন নতুন ভার নিতে থাকি। ভার নিতে না চাইলেও টেকনিক্যাল কারণে তকমা স্বীকার করা লাগতেছেই। রোজগারি দুনিয়ায় তকমাহীন থাকা মানে বেওয়ারিশ, অবৈধ এবং যেন অনৈতিকও। এইটারে আমি বলব, পরিচয়ের পরিহাস বা আয়রনি অব আইডেনটিটি!

তৃতীয়ত, যাবতীয় তকমা এক বা একাধিক পাবলিক ইমেজ নির্মাণ করে। ইমেজ মানে তার একটা ফ্রেমও থাকা। ধরেন 'নির্মাতা' তকমাটা। ই তকমা শুনলে চোখে ভাসে, একটা মানুষ, ক্যামেরা হাতে,

শুটিংরত। কিম্বা এডিটিংরত। আমৃত্যু বর্তমান বা প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট অ্যাকশনের ইমেজ। মানুষটা হয়তো সব সময় শুট-এডিট করে না। হয়তো তার প্রস্তুতি বলতে জীবিকা-যাপন সামাল দিয়া জীবনবোধ পোক্ত করা, চেনা-জানা জিনিসগুলা আনলার্ন করতে থাকা, কিম্বা ভারি কাজের জন্য একটু দম নেওয়া। এগুলা কিন্তু ফ্রেমের বাইরে রাখা হইতেছে।

প্রডাকশনের আগে যে দীর্ঘ, ক্লান্তিকর, পেইনফুল দিন ও রজনী গুজরান করে মানুষটা, তার হিসাব কিন্তু পাবলিক ইমেজে নাই। 'ও, তুমি সিনেমা বানাইতেছো না, তাইলে তোমার তকমা তো ব্যাকডেইটেড, প্রবলেমেটিক।' সেইটা নির্মাতা বলেন, শিক্ষক বলেন, সংগঠক বলেন; সব তকমা সেলফের ইমেজ প্রডিউস কইরা খালাস, কিন্তু সেলফ নিয়া তার কনসার্ন নাই। নিষ্ঠুর তকমার ভার তো বইতে তো হয় সেলফকেই।

আবার যদি খেয়াল করেন, তিনটা বিশেষণের পর আপনি কিন্তু আমারে ব্লগার ডাকেন নাই। বলছেন, ব্লগে লেখালেখি করি। তিনটা তকমা। একটা কাম। হয়তো, ব্লগার তকমা দিলে ভাবতেছেন, আগামীকাল আমার হেফাজতের ভার কে নিবে, এই ভালোবাসায় আপনি কাম বা কর্মটারেই হাইলাইট করছেন।

আচ্ছা, হঠাৎ মনে পড়ল, বিয়া পড়ানো ছাড়া অন্য কোনো কাজ করলে — ধরেন ক্রিকেট খেললে তারে কিন্তু কাজী ডাকেন না। আবার কাজী তকমা শুনলে মাথায় 'কাজের লোক' ইমেজও তৈরি হয় না। ফলে আমি তকমা থেইকা কাজকামটা নিয়া বেশি আগ্রহী, চিন্তিত এবং কৌতুহলী।

বেওয়ারিশ না থাকার জন্য তাইলে এত তকমা পড়তেছেন। আবার মনে হইল, অদৃশ্য অনেক কার্যকলাপ রয়ে যাইতেছে ফ্রেমের বাইরে।

যাকে আপনি তকমা লাগাইতেছেন প্রস্তুতি পর্ব হিসেবে। এই প্রস্তুতি পর্ব কিন্তু অনেক বড় ভূমিকা রাখে ফ্রেমের সাইজ ও শেইপ তৈয়ারিতে। হেফাজতের হাত থাইকা হেফাজত করার জন্যই হোক আর আপনার নিজের ভেতরের অন্য তকমার শক্ত অবস্থানের কারণেই হোক, আপনাকে ব্লগার তকমাটা দিতে চাই নাই। :D আরো সফল তকমা লাগবে আপনার গায়ে। লাগুক আরো। তাতে আখেরে লাভ সবার।

একটু অন্য প্রসঙ্গে আসি। চলচ্চিত্র নির্মাণে আসার পেছনের গল্পটা বলেন। কাকে দেখে আসা? কার অনুপ্রেরণা ছিল পেছনে? যদি খুইলা বলতেন।

পেছনের গল্প মানে কত পেছনে যাবো? ধরেন, শৈশব বা কৈশোরে প্রায়ই মায়ের কাছে, খালার কাছে মামার (মসিহউদ্দিন শাকের, সূর্যদীঘল বাড়ী-র দুই নির্মাতার একজন) গল্প শুনতাম। মামার আর্কিটেকচারে পড়ার গল্প। সিনেমার গল্প। সূর্যদীর্ঘল বাড়ি-তে জয়গুনের (ডলি আনোয়ার) কাস্টিংয়ের গল্প। মামা কিন্তু নিজের মুখে আমারে তার সিনেমার গল্পগুলা বলেন নাই। এমনকি আমি তখনো সিনেমাটা পুরাপুরি দেখি নাই। কৈশোর পর্যন্ত সিনেমাতে আমার তেমন আগ্রহও ছিল না।

সিনেমার চেয়ে বরং আগ্রহ ছিল মামার লেখায়-আঁকায়। আমার মনে আছে, মামার আঁকা একটা বস্তির স্কেচ। হয়তো কয়েকটা টান কিন্তু ভয়ানক ইমপ্যাক্ট তৈরি করছিল মনে। পত্রিকাটার নাম খেয়াল নাই। যেইটা বলতেছিলাম, আমার সিনেমায় কাজ করার পেছনে মামার সরাসরি কোনো অনুপ্রেরণা নাই। অনুপ্রেরণা বলতে পাইছি, পরিবারের মৌন সম্মতির। মানে, সিনেমায় 'নামা'টা যে উচ্ছন্নে যাওয়া না, এই আইডিয়া খাওয়াইতে কোনো বেগ পাইতে হয় নাই। সেই রাস্তা পরিবারে মসৃণ করার জন্য অবশ্যই মামার পরোক্ষ ভূমিকা তো ছিলই।

অনুপ্রেরণা বলতে বড় দুই ভাইয়ের কথা মনে পড়তেছে। আমরা তিন ভাই। আমি সবার ছোট। রাহাত সবার বড়। আমার থেকে সাড়ে বারো বছরের বড়। নব্বইয়ের শুরুর কথা। সে তখনই ইলেকট্রনিক্স সরঞ্জাম বানায়, বিজ্ঞান ক্লাব করে, আবার ছবি আঁকে, গান শোনে, গান গায়, নামে-বেনামে লিখে, আবৃত্তি করে, প্রাইজ পায়, ঘুরেফিরে নিজের মতো। ভাইয়ার এই মাল্টিডিসিপ্লিনে ঘোরাফেরাটা আমাকে খুব মোটিভেইট করছে।

মেঝ ভাই যিনি, ইফতেখার, আমার থেকে সাড়ে সাত বছরের বড়; তার আবার অন্য স্বভাব। সে খুব দাবা খেলে, খুব বই পড়ে, বাম রাজনীতি করে, মহল্লার ওয়েলফেয়ার করে। তার বড় একটা গুণ দেখতাম, সামাল দেওয়া। ম্যানেজমেন্ট। যে কোনো জাগতিক ঝামেলা সামাল দিতে সে আগায়া যায়। এই মেঝজনই আমারে নিয়ে যাইতো স্টেডিয়ামের ম্যারিয়েটা বইয়ের দোকানে, দিলকুশার ইউসিসে, পুরানা পল্টনের ফুটপাতে বইয়ের দোকানগুলায়, রাশান কালচারালে সারেং বৌ দেখতে। স্কুলের টেক্সটবইয়ের বাইরে নতুন দুনিয়া।

দুই ভাইয়ের দুইরকম ভঙ্গি। একজন এমন— নতুন আইডিয়ায় নতুন কিছু করতে থাকো। আরেকজনের ভঙ্গি— একা কইরো না, সবাইরে নিয়া করো। বড় দুই ভাইয়ের বাহারি তৎপরতার জন্য বোধহয় আব্বু বা আম্মুর কাছে আমার ইনিশিয়েটিভগুলা ডালভাত লাগত। ডালভাতের প্রতি সম্মান জানায়াই বলতেছি। ভাইদের কথা বললাম। আম্মু আর আব্বুর কথা আপাতত বাদ রাখি। নিজের সঙ্গে এত স্যাচুরেটেড সেগুলা, এই আলাপ তাইলে শেষ হবে না।

আর বিজ্ঞান ক্লাবের কথা বলতেছিলাম না? ছোটবেলায় বড় দুই ভাইয়ের মতো আমিও বিজ্ঞান ক্লাবে যাওয়া শুরু করি। অনুসন্ধিৎসু চক্র। বাংলা নাম। প্রতি শুক্রবার সভা হইতো। বহুজনের সঙ্গে মিশতাম। বাহারি কাজ করতাম, দেখতাম। মানে, মিডিওক্রেসির স্টেরিওটাইপিং অনেকটা ভাঙছে অনুসন্ধিৎসু চক্র করতে গিয়া। আবার আমি স্বভাবে চাপা, তবু ডায়াসে উঠলে যে ডরাই না, এই যে আমি এক-আধটু লিখতে পারি, ইমোশনালিটির বাইরে র‍্যা শনালিটির প্রলেপটা এপ্রিসিয়েইট করতে পারতেছি, গল্প শুনলে তার কাঠামোগত তুলনা করতে পারি, তার জন্য বিজ্ঞান ক্লাবটারও কিন্তু অনেক অবদান আছে। এগুলাই হয়তো আমার বেইজলাইন, অদৃশ্য অনুপ্রেরণা।

টিনএইজে আরো অনেক কিছু করছি। স্মৃতি থেইকা বলতেছি। ননলিনিয়ার হবে। গোপনে প্রেম করা, জ্ঞানগম্ভীর চিঠিপত্র চালাচালি করা, ছ্যাঁকা খাওয়া, কম্পিউটার প্রোগ্রামিং শেখা, ওপেন সোর্সে ইনিশিয়েটিভে যুক্ত হওয়া, ওয়েব ডিজাইন করা, সাংবাদিকতায় হাতেখড়ি নেওয়া, টাইপোগ্রাফির নেশায় পড়া, লেখক হইতে চাওয়া, দার্শনিক হইতে চাওয়া এবং কিছু কূলকিনারা না পাইরা বা চারপাশের মিডিওক্রেসি দেইখা সবকিছুর প্রতি বিতৃষ্ণা জাগা। টিনএইজ কাল চিন্তা করলে ভাবি, কী স্পিরিট ছিল আমার।

তারপরের গল্প বিশ্ববিদ্যালয় উঠার পর। ভর্তি হইছিলাম প্রথমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতে। পরিবারের আপত্তি সত্ত্বেও মাঝে কলকাতায় চইলা যাই। অখ্যাত একটা কলেজে ভর্তি হই। টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে। মন টিকে নাই পরে। ঘাওড়ামি বাদ দিয়া ঘরের ছেলে ঘরে। ঢাকায় ফিরা আবার গণিতে। গণিতে আমি কখনই মেধাবী ছিলাম না। তবে গণিতের যে একটা দার্শনিক বেইজ আছে, সেইটার খুব মোহ ছিল। ভক্তি ছিল। আমি তখন টমাস কুন, পল আরডস, রামানুজন, বাগোডেলের নাম শুনছি। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের উইঠা দেখি কেইস ভিন্ন। এই গণিত পাঠদান তো ভাই ভীষণ আনরোমান্টিক। তারচেয়ে বড় কথা, ফিলোসফিহীন। চোথাসর্বস্ব। থিওরেম মুখস্থ করো, আর উগরাও। মন বসতো না ক্লাশে। ক্লাশরুম যে কতটা ডিমোটিভেইটিং আর নিরস হইতে পারে, তা হাড্ডিমজ্জায় টের পাইলাম গণিত পড়তে আইসা। স্কুল-কলেজ লাইফেও এমনটা হয় নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ে খালি অমল হালদার স্যারের পেডাগজি স্টাইলটা আমার মনে ধরছিল। একটা বিষয়কে পরিবেশনা দিয়া কেমনে আগ্রহী করানো যায়, যেইটা চোখে পড়ত।

যাই হোক, চোথার চাপে নিজেরে যেন হারায়া না ফেলি, তার কাউন্টার করতে গিয়া আবার নতুন কিছু করার ফন্দি করা। তখনই সিনেমা মাধ্যমটা আবার পাওয়া। তার সঙ্গে নতুন কইরা সম্পর্ক তৈরি। পাবলিক লাইব্রেরিতে সিনেমার উৎসবগুলা এটেন্ড করা, সিনেমা দেখা, বুলেটিনের লেখা সম্পাদনা করা। সিনেমার যে সর্বগ্রাসী শক্তি আছে, অডিয়েন্সকে একই সঙ্গে ইমোশনালি আর ইন্টেলেকচুয়ালি জারিত করার ক্ষমতা আছে, সেইটা টের পাইতেছিলাম।

বাসায় দেখার আয়োজন ছিল না। সহপাঠী জাকির ছিল পার্টনার ইন দ্য ক্রাইম। শহীদুল্লাহ হলে তার রুমে বইসা ভাড়া করা সিডি, ডিভিডিতে প্রথম সিটিজেন কেইন দেখা, ফোর হান্ড্রেড ব্লোজ দেখা, ডেকালগ দেখতাম। তখন কাক বইলা একটা প্রতিষ্ঠান ছিল সাইন্সল্যাবে। তারা সিনেমা দেখাইতো নিয়মিত। রাজেন তরফদারের পালঙ্ক, ঋত্বিকের অযান্ত্রিক, মৃণালের আকালের সন্ধানে, এরকম সিনেমার সঙ্গে পরিচয় শুরু। সব যে বুঝতাম— তা তো না। হয়তো দেখার চেয়ে বেশি তাকায়া থাকতাম, ভাবতাম অন্য কিছু, এক চিন্তা থেকে অন্য চিন্তায় চইলা যাইতাম। রিসেন্টলি মৃণাল সেনের অন্য কাজগুলা দেখতেছিলাম। নতুন নতুন জিনিস আবিস্কার করতেছি। আগে দেখলে বদহজম হইতো নির্ঘাৎ।

আমি তখন পার্ট টাইম লেখালেখির চাকরি করতাম বেঙ্গল ফাউন্ডেশনে। কাজের ফাঁকে অফিসের প্রিন্টার দিয়া সিনেমা নির্মাণসংক্রান্ত যা পাই, প্রিন্ট কইরা বই বানায়া পড়ি। আজিজে (মার্কেট) সিনেমার বই খুঁজতাম। মার্কেজের চিত্রনাট্য কর্মশালার উপর লেখা বই কেমন করে গল্প হয় আর সত্যজিতের বিষয় : চলচ্চিত্র মনে হয় আমার পড়া প্রথম উপাদেয় সিনেমা বিষয়ক বাংলা বই। গাস্ত রোবের্জের লেখাও ভালো লাগতো।

পরে একটা ছোটদৈর্ঘ্যের অনুশীলন সিনেমায় হাত দিই। জাকির ফোন কইরা একদিন বলে, শাহবাগে বাসচাপায় এক স্টুডেন্ট মারা গেছে। হ্যাপি নাম। সে একটা ইমেজের কথা বলে, ধরো হ্যাপিকে না, একটা ফুল চাপা দিতেছে একটা বাস। এই মেটাফোরিক ক্লিশে ইমেজটাই কী কারণে যেন ইনস্ট্যান্ট প্রোভোক করছিল আমারে। মানে, চোখে ভাসতেছিল তৎক্ষণাৎ, শটের পর শট, সিনের পর সিন। তত্ত্বকথার বাইরে মাঠে গিয়া অনুশীলনে নামলাম। বুঝলাম, দেখা এক, বানানো আরেক। হাতে-কলমে অভিজ্ঞতা না থাকায় পাঁচ মিনিটের একটা মামুলি প্রডাকশনের সিনেমাটা শেষ করতে লাগল এক বছর। এই এক বছরটা আমি মনে করি, ফিল্মমেকিংয়ে আমার প্রথম টেকনিক্যাল স্কুলিং।

মামার কথা শুনে হোক, দেখে হোক একটা ইমেজ দাঁড়াইছে আপনার মনে– নির্মাতার। যা গতানুগতিক না নিশ্চয়ই। এমন একজনের প্রভাব পাইছেন যার কাজ ঘরে-বাইরে সমালোচকদের দৃষ্টি কাড়ল কিন্তু সিনেমা হলে চললে না। তথাকথিত ইন্ডাস্ট্রি যাকে তকমা লাগায় ফ্লপ হিসেবে। আবার দুই ভাইয়ের প্রভাব ছিল আপনার স্ট্রাকচারড বা লিনিয়ার, নন-লিনিয়ার জীবনবোধ নির্মাণের পিছনে। সিনেমার নানান শিক্ষা নিজ তাগিদে জোগাড় করসেন নানা মাধ্যম থাইকা। একাডেমিক পড়াশোনা গণিতে হলেও সিনেমা নিয়েই আপনার ক্যারিয়ার। কেন? চোখার গৎবাঁধা সুত্রে আটকা পড়তে চান নাই, সেটাই কি কারণ?

আসলে সিনেমা নির্মাণের জন্য যে একাডেমিক জ্ঞানটা বাধ্যতামূলক না, সেইটা তো আঁচ করছি ছোটবেলার গল্পেই। মামা মসিহউদ্দীন শাকেরের একাডেমিক পড়াশোনা স্থাপত্যে। কিন্তু বানাইছেন সিনেমা। বানাইতে পারছেন তো। কেমনে পারলেন?

অনেকে বলবেন, আর্কিটেকচারের সঙ্গে সিনেমা ডিসিপ্লিনের গভীর বোঝাপড়া। আমার বিশ্বাস— ডিসিপ্লিন যাই হোক, আপনি তার কতটা নিলেন, সেইটা জরুরি। কারো একাডেমিক ডিসিপ্লিন যদি পালি ভাষাও হয়, তাও সমস্যা নাই। কারণ, প্রতিটা ডিসিপ্লিন আপনারে খালি জেনেরিক টুল ধরায়া দিবে। ডিসিপ্লিনগুলা বলবে, কীভাবে জগতরে একটা পার্সপেক্টিভ থেইকা এনালাইসিস করা যায় মাত্র। এর বাইরে ভিন্ন যে পার্সপেক্টিভ, জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, বোধ, প্রজ্ঞা— সেইসব আসে একাডেমির বাইরে থেকে।

ফলে, দুশ্চিন্তার কিছু নাই। বহুবছর গণিতের একাডেমিক সঙ্গ পাওয়ায় যে লাভটা হইছে, কিছু ডিসিপ্লিনারি টুলগুলার এপ্রিসিয়েশন আর এপ্লিকেশন ধরতে পারছি। সিনেমা ডিসিপ্লিনেও সেই টুলগুলাই কিন্তু প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ কাজে লাগে। মূল ঘটনাটা, প্যাশনটা কোথায়। প্যাশনটাই তাড়া দেয় গভীরে উঁকি দিতে, অভিজ্ঞতা করতে, যাপন করতে। সিনেমা প্রডাকশনে শ্রম দিলেও সিনেমারে খালি ক্যারিয়ারের উছিলা হিসাবে দেখতে চাই নাই, চাইবও না। সিনেমার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা বোধ হয় অসংজ্ঞায়িত।

প্যাশন এর তাড়নায় ছুটসেন সিনেমার অলিগলিতে। অসংজ্ঞায়িত সম্পর্কে জড়াইসেন। গণিতের জ্ঞান পরোক্ষভাবে ভূমিকা রাখছে ডিসিপ্লিনারি টুলের বোঝাপড়ায়। নিজ তাগিদে সিনেমার অ্যাপ্রিসিয়েশন আর অ্যাপ্লিকেশনের নানান তরিকা আয়ত্ত করে অনুশীলন কাজ করলেন কয়েকটা। আচ্ছা, ৭২০ ডিগ্রি নিয়া সিনেমার আন্তর্জাতিক উৎসবে আপনি বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করছেন। উৎসবের অভিজ্ঞতাটা কেমন?

বিনয়সহ বলতে চাই, প্রথম প্রতিনিধিত্ব করি শিল্পকর্মটার, সিনেমার। তারপর নির্মাতা হিসাবে নিজের। তারপর বাংলাদেশের। দেশ আর রাষ্ট্রের কনসেপ্টও তো আলাদা। দেশটা দেখি ভৌগলিক-সাংস্কৃতিক জন্মভূমি বা নিবাস হিসাবে। আর রাষ্ট্রটা পলিটিক্যাল সংগঠন। এমনও হইতে পারে, শিল্পকর্মে প্রতিনিধিত্বে রাষ্ট্রীয় লেয়ারটা আমার জন্য বেশি চাপের, বেশি ভারি। এখনো এই রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিত্ব বুঝি না পুরাপুরি।

উৎসবের অভিজ্ঞতা মিশ্র। র‍্যা নডম কয়েকটা বলি। ধরেন, ভেনিসে গিয়া দেখি, ৭২০ ডিগ্রি-টা বাংলাদেশের একমাত্র সিনেমা। কিন্তু ভেন্যুতে কোথাও দেশের পতাকা নাই। বাকিদের পতাকা উড়তেছে। উৎসব অফিসে জানাইলাম। তারা ভুল স্বীকার কইরা ক্ষমা চাইয়া কয়েকদিন পর পতাকা দিল। আমার তখন হয়তো ব্যক্তি বা শিল্পকর্মের চেয়ে রাষ্ট্রীয়বোধটা বেশি চাপছিল।

আবার রটারড্যামের এক অডিয়েন্স বলে, 'তোমার সিনেমাটা খুব ন্যাশনালিস্টিক।' আমি তো অবাক। একটু কাউন্টার করতে যাই। সে বলে, 'তোমার সিনেমায় ইমেজটা খেয়াল করব। যেমনে বৃত্তে বন্দি কইরা পরিবেশন করছো, লাগে ঠিক বাংলাদেশের পতাকার মতো।' আমি হাসি। বলি, বাহ এইটা তো ডিফরেন্ট রিডিং। মনে মনে বলি, তাইলে জাপান কী দোষ করল?

আবার জাপানের এক উৎসবে দেখাইতে গিয়া উপলব্ধি করি, উৎসবের ঘনঘটা আছে খুব, আমার সেবা আছে, বাংলাদেশের পার্টিসিপেশন আছে, শুধু সিনেমাটা নাই।

বড় উৎসবে গিয়া নবীন ইন্ডিপেনডেন্ট নির্মাতারা মনে হয় একটু কোণঠাসায় থাকে। যেমন; আমার কোনো সেলস এজেন্ট ছিল না। আমারেই প্রচারণায় নামতে হইছে। 'ভাই, আইসেন, দেইখেন।' ক্যানভাসারের মতো দশা। সম্ভাব্য প্রডিউসারের সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলা। তারকোভস্কির একটা ইন্টারভিউ ক্লিপ দেখছেন না— যেখানে সে বলতে থাকে, সিনেমা এখন সিগারেট বা আট-দশটা পণ্যের মতো বেচতে হয়। উৎসবে ঘুরতে ঘুরতে ওই অনুভূতিটা উপলব্ধি করছি অনেকবার।

আমার অভিজ্ঞতায় বলে, উৎসবের মনোনয়ন বা পুরস্কার উৎসাহ দেয় ঠিকই। কিন্তু তা নবীন নির্মাতারে পঙ্গুও কইরা দেয়। সেলফটা হারায়া যায়। সেলফের ইমেজটা বড় মনে হইতে থাকে। নিজের ভিতর সেন্সরশিপ আসে। ব্লক আসে। উৎসব তকমার একপেশে ভার বইতে হয় দীর্ঘকাল বা আজীবন। বড়াই আসে মনে। সিনেমার সঙ্গে ইনোসেন্ট সম্পর্কটা আর থাকে না। আমার এমন হইছে। এইটা কাটায়া উঠতেই এত বছর হয়তো লাগতেছে।

তবু উৎসবরে সবসময় উপেক্ষা করা যায় না। দুনিয়াতে সিনেমার তকমাঅলা উৎসবগুলারে এখন অ্যাপ্রিশিয়েট করি একটা বাজার হিসেবে। যৌথ প্রযোজনার মিলনমেলা হিসেবে। বহুদেশের শিল্পী-অশিল্পীদের সঙ্গে নেটওয়ার্কিংয়ের উছিলা হিসেবে। কারখানার অংশ হিসেবে।

উৎসবে গিয়া আরেকটা লাভ হইছে, সিনেমার উৎসব নিয়া মোহ/মিথ ভাঙতেছে অনেকটা। সিনেমাটা ভালো না খারাপ লাগা উচিত, তা আর উৎসবের লরেল পাতা গুইনা বিচার করতে বসি না। সিনেমার মতো উৎসবের ভালো-খারাপও খুব সাবজেক্টিভ আর বৈচিত্রময়। সিনেমা মাধ্যম অন্য মাধ্যমের সঙ্গে টিকে থাকার লড়াই করতেছে, উৎসবগুলাও যে যার মতো কৌশল পাল্টায়া টিকে থাকার লড়াই করতেছে। এগুলা নিয়া সচেতন হইতে পারলে, দূরত্ব রাখলে একটু বোধহয় নির্মোহ হওয়া যায়; তকমার আড়ালে মগ্ন থাকা যায় নিজের কর্মেও।

তার মানে আপনি উৎসবকে একরকম বাজারি পারপাসে দেখছেতেন। উৎসবের পিছনেও ছুটতেসেন না, আবার মূলধারার কারখানার পণ্যের মতো কনটেন্টও জোগান দিতে চাচ্ছেন না। ইনোসেন্ট সম্পর্ক রাখতে গিয়া আবার নতুন তকমা লাগাইতে যাচ্ছেন। টি–টোয়েন্টি না খেলে টেস্ট ম্যাচে আগ্রহ বেশি আপনার। ধরেন, এ দেশে অনেকে সিনেমা বানানোর আগে টেলিভিশন ফিকশনে কাজ করেন। কিন্তু আপনি সিনেমা ছাইড়া এই পথে আসেন নাই। কেন?

টেলিভিশনে ঢুকি নাই না। ঢুকতে পারি নাই। তবু একসময় মনে হইছিল, এত এলিটিপনার কী আছে। জীবিকার জন্য কত মানুষ কত কী করে। কনটেন্ট পরিচালনা করলাম না হয় টিভির জন্য। চেষ্টা করছিলাম, কুলায়া উঠতে পারি নাই। আমি ভালো হুটোপুটি-কাড়াকাড়ি খেলতে পারি না।

পাশাপাশি, দূর থেইকা ফলো করতাম তারেক মাসুদের যাপনরে। তিনিও একটা অনুপ্রেরণা ছিলেন হয়তো।

আমি ঢুকি নাই, কিন্তু আমার সময়ে অনেকেই ঢুকছে। একেকজনের পরিস্থিতি, পথ আলাদা। টেলিভিশন চ্যানেলগুলাও তখন তরুণদের পালস বুইঝা লেনদেনের সুযোগ তৈরি করতে পারছিল। অন্যদিকে, সিনেমার লোকাল কারখানাগুলা কিন্তু তরুণদের পালসগুলারে পাত্তা দেয় নাই। ধরেন, এফডিসি। আমলাতন্ত্রের আখড়া। সিন্ডিকেটে ভরা। আমি সেইখানেও চেষ্টা করছি ঢুকতে। খুব কঠিন তো

টেলিভিশনের মেকানিজমটা সিনেমার থেকে আলাদা। তার পলিসি এমন— কর্পোরেট স্পন্সরদের কাছ থেকে সময় কিনো। যেটুকু সময় বাঁচবে, সেটুকু পূরণ করো চটকদার কনটেন্ট ঢুকায়া। তাদের কৌশলটা দেখেন। নিজেরাই সিনেমার প্রযোজকের মুখোশ পইড়া নাইমা গেছে। ওই যে বললাম, বাজারের চাহিদা বোঝা। পালস ধরা। তরুণ মুখোশটা দেখছে— সিনেমা বানাবো সেলুলয়েডে, ক্ষতি কী? টাকা আছে, ঢালো, সেইটা টিভিতে প্রিমিয়ার করো বিজ্ঞাপনের ফাঁকে ফাঁকে। পয়সা উসুল। এইখানে সিনেমার বৈচিত্র কই, নির্মাতার নিজের স্বর কই, বাণিজ্যের বাইরে শিল্পকর্মের রসটা কই?

টিভিতে না ঢুকতে পারার আরেকটা কারণ, টিভির ভঙ্গিটা। টিভি মিডিয়ামের প্রাকটিসটা খুব মনোলিথিক। টেলিভিশন গড়পরতা যেইভাবে হাজির করতে চায় অডিওভিজুয়ালি, সেইভাবে আমি নাও চাইতে পারি। এই হাজিরাটা শটের আকার বা টিভির স্ক্রিন সাইজ নিয়া না। এই হাজিরা বলতে মানুষ-সময়-স্থানের রেপ্রিজেন্টেশন বুঝাইছি। টিভিতে হাজিরাটা অসংবেদনশীল। টিভিতে কনটেন্ট প্রোগ্রামিং হয় স্পন্সরের এজেন্সি অনুমোদিত টার্গেট অডিয়েন্সের রুচির টলারেন্স অনুমান কইরা। ফলে আমি কী চাই বা না চাই, তা নিয়া টিভির মাথাব্যথা নাই। কারণ টিভির ফরম্যাট-স্ট্যান্ডার্ড বুইঝা বাজারে কনটেন্ট সাপ্লাই দেয়ার লোক তো অনেক।

ধরেন, আমি চাইলাম— সমপ্রেমী যুগলের সামাজিক পরিচয় সঙ্কট, তাদের মানসিক টানাপোড়েনটা দেখাবো। ডিজাইনে রাখলাম ক্লোজআপ শট কিন্তু দীঘল টেক, সংলাপময় কিন্তু ননডায়াজেটিক মিউজিকহীন, ন্যারেটিভ স্ট্রাকচারটা একটু অ্যান্টিড্রামাটিক, ইমেজের টোনটা সাদাকালো আন্ডারএক্সপোজড এবং তা ব্রডকাস্টের সময় কোনো বিজ্ঞাপন বিরতি থাকবে না। টিভি মিডিয়াম কি এই শর্তগুলা মানবে? আইডিয়াটা অ্যাপ্রিসিয়েট করা দূরের থাক, অনুমোদন করবে? সিনেমা মিডিয়ামটা করবে। এমনকি কোনো না কোনো প্রযোজক-পরিবেশক-প্রদর্শক আগায়া আসবে এর জন্য। ২০০৬-২০০৭ এ আমি চেষ্টা করছি টিভিঅলাদের সঙ্গে বাহাস করার এই বিষয়ে। পরে বুঝলাম, কবি ওইখানে নীরব।

সিনেমা ডিসিপ্লিনটা যত চর্চা করতেছি, তত উপলব্ধি করতেছি টিভির চেয়ে এই মাধ্যমটা অনেক ইনক্লুসিভ। অনেক কনটেমপ্লেটিভ, সংবেদনশীল, কিম্বা সহনশীল।

আমিও হয়তো এই গুণগুলাই খুঁজতেছিলাম এতদিন কোনো না কোনো প্রকাশ মাধ্যমে। তাই সিনেমার খেদমত করার সিদ্ধান্তে আসা।

দীঘল টেক, মিউজিকহীন, অ্যান্টিড্রামাটিক স্ট্রাকচার, সাদাকালো আন্ডারএক্সপোজড, বিরতিহীন সম্প্রচারের শর্তে রাজি হইল টিভিঅলারা। তাইলে কী টিভি ফিকশনে আসতেন বা আসবেন? এ দেশে সিনেমা নির্মাণ নিয়া আপনার ভাবনা কী? যৌথ প্রযোজনার হাতে মূলধারার সিনেমা। মোস্তফা সরয়ার ফারুকী কাজ করলেন জাজ মাল্টিমিডিয়ার সাথে। আপনি কেমন দেখেন ব্যাপারগুলা?

টিভি যদি এতই উদার হয়, আমার তখন বানাইতে এলার্জি নাই। তবে আমি এখন অনলাইনের জন্য নির্মাণগুলায় আগ্রহ পাইতেছি। ন্যারেটিভ ও নিরীক্ষার স্বাধীনতা বেশি।

আমার সময়ে সিনেমার মাধ্যমগত যে চর্চা দেখছি, তাতে মনে হয়— আমরা বোধহয় সিনেমা মিডিয়ামটারে খালি সাহিত্যিক ন্যারেটিভ ফাংশন মিটানোর জন্যই টানাটানি কইরা গেছি। যেই কারণে ভ্রম কাটে না নির্মাতাদের বা অডিয়েন্সের— কোনটা একান্তই সিনেমাটিক, কোনটা ড্রামাটিক, আর কোনটা থিয়েট্রিকাল?

আইডিয়ালি বললে, যে কোনো ধারায় বা যূথচারিতায় আপত্তি নাই। আমি বৈচিত্র্য ভালো পাই। প্রযোজনা করতে আসুক না ভারত বা সৌদি আরব, সিঙ্গাপুর বা লাটভিয়া। যৌথ প্রযোজনায় শ্রমের বাজার বাড়ে, লেনদেন হয়, হইতে দেন না।

প্রাকটিক্যাল কথা হইল, প্রযোজিত সিনেমার কনটেন্ট-ফরম্যাটগুলা কেমন হইতেছে? সবগুলা কি ছাঁচে ফেলা, কপিপেস্ট? ধরেন, ইনায়া বিনায়া টালিউডি ভূত? কিম্বা কনটেন্টগুলা কোন বাজারে কেমন শেয়ারে পরিবেশিত হইতেছে? নামে যৌথ, কামে একপেশে বা বৈচিত্র নাই, শিল্পচেষ্টা নাই— তাইলে তো বিপদ।

আমার মনে হয়, খালি জাতীয়তাবাদী চর্চা করতে যারা সিনেমা মাধ্যমটা ব্যবহার করতে চান, তারা বরং আরো লোকাল কনটেন্ট বানাক লোকাল উপায়ে। দেশে-বিদেশে সাপ্লাই দিক। আবার খালি অ্যান্টি-ভারত কইরা যে জাতীয়তাবাদী জোশ পাইতেছি আমরা, সেইটা কি বেশ উগ্র মনে হয় না?

তার মানে যৌথ প্রযোজনায় চুলকানি নাই আপনার। আপনার টেনশন গল্প লইয়া, মানে জিনিসটা কী দাড়াইলো সেটা মুখ্য। :) আপনার নয়া সিনেমা সিনেমা, সিটি অ্যান্ড ক্যাটস নিয়া বলেন। লোকার্নো ঘুইরা আসলেন।

লোকার্নোর অভিজ্ঞতাটা আমার জন্য নতুন। পিচ করতে গিয়া বুঝছি, আমি কতটা অপ্রস্তুত আর এলোমেলো। আবার লোকাল কনটেক্সটগুলা ঠিক টোনে বুঝাইতে পারাটাও ঝক্কির বিষয়। আন্তর্জাতিক প্রযোজনায় অনেক সময় লাগে। আপাতত দুই দেশের দুই প্রযোজনা সংস্থা অন-বোর্ড হইছে। সিঙ্গাপুরের আকাঙ্গা এশিয়া, বাংলাদেশের খনা টকিজ। প্রডাকশন ফান্ডিংয়ের জন্য আরো প্রযোজক খুঁজতেছি। সময় লাগবে।

প্রস্তুতি পর্বে আপাতত দম নিতেছি। নয়েজ থেকে সিগন্যাল আলাদা করার চেষ্টা করতেছি।

শিক্ষক রোলে যা পড়াইছি এতদিন, তা আসলে ডিসিপ্লিনটার বেসিক বোঝাপড়া। তার বাইরে আমার জীবনবোধ বা সিনেমা মাধ্যম নিয়া আর কী বোঝাপড়া আছে, তা আবিষ্কার করার চেষ্টা করতেছি। পছন্দের সিনেমা বা নির্মাতার আছর যেন না লাগে, তার এন্টিবডি গ্রো করতেছি। একান্ত আমার তরিকায়। আমার মনে হয়, তাড়াহুড়ার কিছু নাই। অন্য কাজ থেইকা মুক্ত হইয়া আরেকটু ডুব দেয়া লাগবে এখন। প্রজেক্টের যে টাইমলাইন নিছি, তাতে ২০২০ লাইগা যাবে। ততদিন ঠিকঠাক বাঁইচা থাকার লড়াইটা চালাইতে হবে। প্রত্যেকটা মানুষের বাস্তব পরিস্থিতি আলাদা। এইখানে আমার কম্পিটিশনটা, বোঝাপড়াটা, লড়াইটা নিজের পরিস্থিতির সঙ্গেই।

আপাতত চাইতেছি, নিজের অভিজ্ঞতায় ঢাকা শহরের কিছু মানুষ আর সম্পর্কের স্কেচ ধরতে। আমার জন্ম, বাইড়া ওঠা সব ঢাকা শহরেই। এত বিচিত্র মানুষ, তাদের রি-লোকেশন বা মাইগ্রেশন, সেইখানে আমি কোথায় কতটুকু বিলং করতেছি? আরবান আইডেনটিটি সিনেমাটার একটা সেন্ট্রাল থিম হয়তো। খুঁজতেছি, আমার মতো আর কোন চরিত্র আছে কিনা, যারা শহরের সঙ্গে অসংজ্ঞায়িত সম্পর্ক নিয়া ঝুইলা আছে। যাদের যাপনের কর্ম আর জীবিকার তকমার সেতুটা অত সরল না। অ্যানথ্রপলজিক্যাল অ্যাপ্রোচ আছে হয়তো। যাই হোক, যা এখনো তৈরি হয় নাই, সেইটা নিয়া কম বকবককরাই ভালো না?

ভালো বলছেন। একেবারে ইমেজ–শব্দের নির্মাণটা দেখাই ভালো, রিলিজের পর।:D তবে আরেকটা কৌতূহল– দুই ধরনের অ্যাপ্রোচ দেখা যাইতেসে এদেশের সিনেমা প্র্যাকটিসে। কেউ খালি বাইরের ফেস্টিভ্যাল টার্গেট করতেসেন, কেউ মূলধারায় বাণিজ্যিক সিনেমা বানাইতেসেন। আপনি নতুন পূর্ণদৈর্ঘ্য সিনেমায় কী কী বিষয় মাথায় রাখতেসেন ?

মূলধারার বাণিজ্যিক সিনেমার বিশেষণ যেইটা দিলেন, সেইটা কি এফডিসি-ইমপ্রেস-জাজ প্রযোজিত প্রডাকশন বিবেচনা করব? সেই প্রডাকশনগুলার সঙ্গে আমি মনে হয় অ্যাসোসিয়েট করতে পারি না। ধরেন, মাধ্যম নিয়া কোনো নিরীক্ষা নাই। প্রডাকশনের টেকনিকসগুলা, ফরমুলাগুলা খুব চেনা, বারবার ব্যবহৃত। মানুষ বা সম্পর্কগুলার হাজিরা খুব প্লাস্টিক, রঙিন আর দ্বিমাত্রিক। অডিয়েন্স কখন কেমনে আবেগতাড়িত হবে, সেগুলা খুব আঙুল দিয়া দেখায়া দেওয়া। এগুলায় আমার মন বসে না।
আর ফেস্টিভ্যাল টার্গেট কইরা সিনেমা বানানোটা যেন অন্ধকারে ঢিল ছোড়া। যারা বাইরের উৎসবগুলার অভিজ্ঞতা নেন নাই, তারা মনে হয় এমন টার্গেট করেন। কারণ, ফেস্টিভ্যালও তো লাখ লাখ, বাহারি তার প্রোগ্রামিং। আর কান-ভেনিস-বার্লিনের মতো পুরান ব্রান্ডের উৎসবগুলার কার্যক্রমও যদি ফলো করেন, দেখবেন তারা নিজেরাই নিজেদের টার্গেট রিভিশনে ব্যস্ত। নিজেরাই নিরীক্ষা করতেছে। কখনো ক্রস মিডিয়ারে জায়গা দিতেছে, কখনও লো-বাজেটকে প্রমোট করতেছে, কখনো তাদের জিওপলিটিক্যাল ইস্যুগুলারে সামনে আনতেছে, কখনো দুই আন্তঃমহাদেশীয় হাটবাজার খুইলা বসতেছে, কখনো লোকাল কনসালটেন্ট দিয়া কনটেন্ট কিউরেট করতেছেন। খুব আনপ্রেডিকটেবল, আনসারটেইন। উৎসবের জেনেরিক ফরমুলা তো নাই যে তা ফলো করলেই সিনেমাটা নিয়া নিবে উৎসবগুলা।

প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য সিনেমার প্রস্তুতিতে যেইটা মাথায় রাখতে চাইতেছি, লোভটা সামলানো। ইনোসেন্ট থাকা। সিনেমাটা আমার আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের মাপে হবে কিনা, চিন্তায়-ভাবনায় ডিজাইনে সেইটা চেক দেওয়া। মোটিভেশন ছাড়া টেকনিকস যেন না প্রয়োগ করি। পছন্দের উৎসবের কয়েকটা সিল-ছাপ্পড়মারা স্যাম্পল সিনেমা এনালিসিস কইরা একটা খিচুড়ি যেন না হয়। আমজনতার সঙ্গে যোগাযোগ করতে গিয়া আমি যেন না হারাই। সবাইকে খুশি কইরা, সবার মন জুগায়া সিনেমা করার চেষ্টা তো ক্লান্তিকর। মানে, মাথায় রাখা, নির্মাতা হিসাবে যেন নিজের সিনেমাটার প্রতিনিধিত্ব করতে পারি।

সিনেমার প্রাকটিসে চাইব, অঁতর ইন্ডিপেনডেন্ট তকমার সিনেমাগুলাও দেশ-বিদেশে বাণিজ্য করুক। টাকাপয়সা যদি উঠে, প্রযোজকরা অখুশি হবে না আশা করি। তবে আমার আত্মবিশ্বাস বলে, আমার বেলায় উঠবে না। কারণ লগ্নিকৃত টাকা উসুল করার বাণিজ্য করতে গেলে ন্যারেটিভে যে মাত্রায় আপোষ করা লাগে, সেইটা আমি চাই না। তবু হয়তো দুয়েকজন প্রযোজক রিস্ক নিতে আসবে। হয়তো তাদের আশা— সিনেমাটা কোনো উৎসবে মনোনয়ন পাবে, তাতে তাদের পোর্টফোলিওটা ভারি হবে। সুখের কথা, এখন পর্যন্ত আমার প্রডিউসাররা কোনো বাণিজ্য বা উৎসবের চাপ দেয় নাই। তাদের প্রতি শুকরিয়া।

আপনাকে বলা হইত ছোট সিনেমার কারবারি। বড় সিনেমা ধরলেন কেন?

আমি যে ছোট সিনেমার কারবারি, এই শিরোনামে প্রথম পরিচয় করাইছেন মোস্তফা সরয়ার ফারুকী ভাই। প্রথম আলোর এক লেখায়। কয়েক বছর আগে কোনো এক আলাপে উনারে বলতেছিলাম, ছোটদৈর্ঘ্যের সিনেমাই বেশি এনজয় করি। তখন সাউথইস্ট লাভস বইলা পাঁচ দেশের একটা অমনিবাসে প্রজেক্টে ছিলাম।পরে হয় নাই আর। আবার ভেনিসে তখন গেল ৭২০ ডিগ্রি। এগুলা বিচার কইরা হয়তো এই তকমা দিছেন তিনি।

সত্যিটাও তাই। ছোটদৈর্ঘ্যটা খুব চ্যালেঞ্জিং লাগে। কাউন্টার এস্টাবলিশমেন্টের অনুশীলন বেশি করা যায় ছোটদৈর্ঘ্যে। তবে সব অভিজ্ঞতা আর উপলব্ধি এক দৈর্ঘ্যে প্রকাশও করা যায় না। যেমন, টুরিন হর্স সিনেমাটা পাঁচ মিনিটে প্রকাশ করতে কি একই ইমপ্যাক্ট হইত?

বড়দৈর্ঘ্য করার সিদ্ধান্ত নিলাম, কারণ যেই শহরের-মানুষের-সম্পর্কের টাইম-স্কেচটা আঁকতে চাই তার জন্য বড়দৈর্ঘ্যটাই জুতসই মনে করতেছি। আর নিজের পরিচয়রে দৈর্ঘ্য বা ফরম্যাটের তকমা থেইকা মুক্ত করার ইচ্ছাটাও ছিল, আছে।

আহ। টুরিন হর্স। বড় ক্যানভাসের এত সুন্দর পরিবেশনা সম্ভবত তারকোভস্কির পর করলেন বেলা সাহেব। লাভ ডিয়াজ করতেসেন তার মতো করে। আর অমনিবাস প্রজেক্ট নিয়া বলায় মনে পড়ল, আপনি বিড়ালপাখির ব্যানারে অমনিবাস প্রজেক্ট চালু করসিলেন গত বছর। তার কী খবর? আর সিনেমা স্কুল বা স্কুলিং নিয়া আপনার ভাবনা কী?

চাকা বারবার যেন না আবিষ্কার করতে হয়, তার জন্য স্কুলে আসো। টেকনিকস শিখো, ক্রাফট শিখো, নিজের গল্প বলো। সিনেমার স্কুলগুলা, ইনস্টিটিউটগুলা, একাডেমিগুলা তো এইভাবেই প্রচারণা চালায়।

সিনেমার ফরমাল স্কুলিংটা আপনারে কারখানা অনুমোদিত ও ব্যবহৃত কৌশলগুলা শিখায়। এইটা আপনার সময় বাঁচাবে হয়তো। কিন্তু ঠেইকা শিখার মজাও আলাদা। নয়তো কারো কারো বেলায় মগজটা অলস হইয়া যাইতে পারে। ন্যারেটিভ বা ননন্যারেটিভের নতুন বা নিজস্ব কৌশল-ভাষা-ভঙ্গি-প্রথা খুঁজতে যে যন্ত্রণাটা লাগে, কল্পনাশক্তিটা লাগে, শ্রমটা লাগে— তা হয়তো একাডেমিক স্কুলিংয়ের সিলেবাসে নাই।

তবে এখন সিনেমার স্কুল বা স্কুলিংয়ের ভূমিকাও বদলাইতেছে। কারিগরি ইনফরমেশন উপচাইতেছে

সবখানে। স্কুলগুলা নামছে তাই নলেজ কিউরেট করতে। সবাই খুব নেটওয়ার্কিংয়ে জোর দিতেছে। নিউ মিডিয়ার ভাষা-ভঙ্গি আয়ত্ত্ব করতেছে। আগামীতে এইটার রাজত্ব থাকবে বইলা অনুমান। আগে যেমন সৃজনশীল প্রকাশ মাধ্যম ছিল থিয়েটার, এখন সিনেমা, পরে হয়তো গেইম বা অ্যাপ্লিকেশন হবে। বাজারও চায় নিত্য নতুন অভিজ্ঞতা দিতে। থ্রিডি সিনেমা আর অগমেন্টেড রিয়েলিটির অভিজ্ঞতা তো নতুনই। বাজারের লোকজনও তাই প্যাট্রনাইজ করতেছে পশ্চিমা দেশের স্কুলগুলারে তার স্কুলিং মেথড ঠিক করতে।

তবে ফরমাল স্কুলিং সবার দরকার, এমনটা মনে হয় না। এর বিকল্প তরিকাও আছে। যেমন, আনস্কুলিং। এর ফিলসফিটা হলো— কোনো কারিকুলাম নাই। ভবিষ্যতে কোন জ্ঞানটা লাগতে পারে, তা অনুমান কইরা আগেভাগেই সব শিখানোর তাড়া নাই। যখন যেইটা দরকার, তখন সেইটা। যেমন; ইউনাস মেকাসের স্কুলিং মেথডটা মনে হয় আনস্কুলিং।

আর বিড়ালপাখির অমনিবাস এখন পোস্টে। আগামী বছর আসতেছে।

আনস্কুলিং বা আনলারনিং যাই বলেন এটা ব্যক্তির নিজের পরিসর বাড়ানোর জন্যই দরকার। আমার মনে হয়, প্রথা বা রীতির বাইরে চিন্তার বিকাশের জন্য লাগে এই আনলারনিং। একটা স্টেরিওটাইপ প্রশ্ন করতাম, কাদের সিনেমা নির্মাণ ভালো লাগে? দেশে বা বাইরে।

ভালো লাগা বদলায়। দেশের ভিতর ফেলোদের মধ্যে মেহেদী হাসানের কাজ ভালো লাগে। তবে প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য সিনেমা প্রজেক্ট শুরু করতে যাদের সিনেমা আমাকে ভাবাইছে, ভাবাইতেছে তাদের মধ্যে অন্যতম রয় এন্ডারসন, মৃণাল সেন, বেলা টার, লাভ ডিয়াজ, সাই মিং লিয়াং, মিশাইল হানাকে, পেদ্রো কস্তা, হো ৎসু নিয়েন, সিয়োন সোনো, জাফর পানাহি, জিম জারমুশ। এদের সিনেমাটিক টাইম-স্পেইস ডিজাইন আর ন্যারেটিভ হ্যান্ডেলিং ইন্টারেস্টিং। ঘটনাটা খালি দেখায়া দেওয়ার তাড়া নাই। সাসপেন্স আর জাদুর ছলচাতুরি দিয়া সেই সিনেমার চল শুরু হইছে সবখানে, সেগুলা ঠেকা দেয় এদের সিনেমা।

তার মানে টাইমস্পেস নিয়া যারা স্লো ডেলিভারি কইরা ভালো খেলতে পারেন, তাদের ম্যাচ উপভোগ করেন বেশি। মেহেদী হাসানের আই এম টাইম দেখা হইসে। উনার কাজেও নিরীক্ষা পাই। আচ্ছা নেটফ্লিক্স, ইউটিউব বা অনলাইন স্ট্রিমিংয়ের যুগে সিনেমার নয়া আঙ্গিক কী হবে? যারা আগামীতে সিনেমা বানাইতে চায়– তারা কী করবে? কী করা উচিত?

নিজেরে যদি বলি, তাইলে এইভাবে নোট রাখব :
১. নৃতাত্ত্বিক জায়গা থেকে দেখলে, সিনেমাটা মানুষের জন্য। মানুষকে কোনো না কোনো অভিজ্ঞতা দেয় সিনেমা। বোধ জাগায়। তাই মানুষের বোধগুলা আগে ধরতে হবে। সব মানুষ যে এক না এবং সবারই গুরুত্ব আছে— এইটা বুঝলে ভালো। তার সংস্কৃতি, সভ্যতার অনন্য ইতিহাস আছে। তার রেপ্রিজেন্টেশন নিয়া সচেতন থাকতে হবে।

২. মিডিয়ামটার রস নেওয়া দরকার আগে। সীমাবদ্ধতা কোথায়, শক্তি কোথায়, অন্য মিডিয়াম থেকে কোথায় মিল, কোথায় তফাৎ— এগুলা নিয়া পরিস্কার ধারণা রাখা দরকার।

৩. প্রযুক্তিটাই সিনেমা না। তবু সিনেমা নির্ভর করতে হয় প্রযুক্তির উপর। আজকে অনলাইন স্ট্রিমিং।

কালকে আসবে হলোগ্রাফিক ইন্টারঅ্যাকটিভ প্রজেকশন। পরশু অন্য কোনো ডিস্ট্রিবিউশন বা প্রজেকশন আসবে। প্রযুক্তির কারণে মাধ্যমের অভিজ্ঞতাটা বদলায় নিশ্চিত। কেমনে কতখানি বদলায়, তা নিয়া সজাগ থাকতে হবে, ভাবতে হবে। যতই বলি, চলেন সিনেমা হলে। তবু লোকেরা ফোনে, ট্যাবলেটেই (বড়ি অর্থে না) সিনেমার স্বাদ নিবে। ফলে কোথায় কীসে দেখানো হবে, কীসে শোনানো হবে, সেইসব সরঞ্জাম নিয়াও ধারণা রাখা দরকার।

৪. সিনেমাটারে ইন্টারঅ্যাকটিভ ডিজাইন হিসাবে দেখতে হবে। ওয়েবসাইট বা সফটওয়্যারের মতো। ডিজাইন বদলাইলে ইউজার এক্সপেরিয়েন্স বদলায়। তবে ওয়েবসাইটের লিংকটা প্রাইভেটও হইতে পারে।

ইন্টারঅ্যাকটিভ ডিজাইন মানে তো অনেকটা গেমের মত ট্রিট করা। প্রযুক্তির বাইরে সিনেমার রস আস্বাদনে আপনি বিশ্বাসী। বাউন্ডারিটা পুশ করতে চান। তাহলে কী দাঁড়াইলো— সিনেমার কোন ধারায় আপনি বিশ্বাস করেন? শোনা যায়, অনেক এক্সপেরিমেন্টাল বা নিরীক্ষাধর্মী পছন্দ করেন। ধারা মানে সেই তকমা, জঁরা, লেবেল, ট্যাগ। আমি জাস্ট সিনেমাতে বিশ্বাস করি। যেই সিনেমা তার সংজ্ঞা, সীমা পাল্টাইতে নিরীক্ষারত। আমার ভালো লাগে যখন তকমার বেড়াগুলা ভাঙতে থাকে। ফিকশন আর ননফিকশনের বেড়া। লাইভ অ্যাকশনের আর অ্যানিমেশনের বেড়া। ন্যারেটিভ আর ননন্যারেটিভের বেড়া। সেলুলয়েড আর ডিজিটালের বেড়া। বেড়াগুলা ভাঙলেই নিরীক্ষার শুরু। নিজের সিনেমাটিক কাজ খুব একটা নাই। তবে অন্যদের নিরীক্ষামূলক কাজ উপভোগ করি। ক্রিটিক্যালি পাঠ করার চেষ্টা করি। নিরীক্ষার আলামতগুলার কী মানে তৈরি করে, কেমন অনুভূতি সঞ্চার করে— এইগুলা বিবেচনা করি।

বিড়ালপাখি সিনে ক্লাব নামে একটা সংগঠন চালাইতেছেন। কেন এই নাম? কেমন সাড়া পাইতেসেন?

প্রশ্নটা অনেকেই করেন। বিড়ালপাখি নামকরণের ইশতেহারটা রিপিট করি বরং; বিড়ালপাখি একটা নয়াপুরাণ। সমকালীন হাইব্রিড মাল। সুকুমারের যেমন হাসজারু। বকচ্ছপ। সিংহরিণ। হাতিমি। আদিপুরাণের ইউনিকর্ন। বোরাক। মারমেইড। স্ফিংক্স। কিম্বা গণেশ। বিড়াল কৌতূহলী। পাখি উড়ুক্কু।

বিড়ালপাখি এদের মন্তাজ। বিড়ালপাখি সিগনিফায়ার। সিনথেসিস। গুরুচণ্ডাল ভাষা। বিড়ালপাখি একটা প্রস্তাবনা। প্রস্তাবিত সিনেমাটিক ঈশ্বর।

বিড়ালপাখিতে ভালো সাড়া পাইছি। প্রথম বছরে আমরা ১২টা মজমা করলাম। ৪টা কর্মশালা। ২টা পাঠচক্র। সামনে আসতেছে প্রকাশনা। সরকারি নিবন্ধনের আনুষ্ঠানিকতা শেষ হইল। ৭০ জন নির্মাণশ্রমিক কর্মী হওয়ার আবদার করছেন। আশার কথা, মজমার উছিলা কয়েক শো অনুশীলন স্বল্পদৈর্ঘ্য সিনেমা বানানো হইছে। সেগুলার উদ্বোধনী প্রদর্শনী করছি মজমাতে।

নতুনদের জন্য অনুপ্রেরণাদায়ক বেশ এই মজমা। নতুন কাজ দেখানোর বা নতুন তকমা লাগানোর নয়া প্ল্যাটফর্ম। অনেক ফিল্ম সোসাইটি মুভমেন্ট আছে বা ছিল এদেশে। এটা কোন দিক থেকে আলাদা?

বিড়ালপাখি সিনে ক্লাবটা প্রথমত খালি দর্শকের না; নির্মাতাদের। নির্মাণশ্রমিকদের। তরুণ নির্মাণ-শ্রমিকদের সংগঠন এইটা। আমরা একটা নেটওয়ার্ক গড়তে চাই সিনেমা নির্মাতাদের,

নির্মাণশ্রমিকদের, নির্মাণপ্রেমিকদের নিয়া। যারা নতুনতর ভাষায় গল্প বয়ানের নিজস্ব, দেশজ, অব্যয়, সামান্য তরিকা খুঁজতেছেন। আপাতত এই, বাকিটা কাজ করলে বোঝা যাবে।

তার মানে এই ক্লাব দর্শক না, নির্মাতা নিয়া ভাবে। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কী এই ক্লাব নিয়া?

চলতি বছরের পরিকল্পনা এমন— মজমা, প্রশিক্ষণ কর্মশালা আর পাঠচক্র চালু রাখা। একটা রেসিডেন্সির উদ্যোগ নেয়া। একটা সিনেমা জার্নাল বের করা। ওয়েবসাইট চালু করা। গতবছর শুরু করা অমনিবাস সিনেমা প্রজেক্টটা শেষ করা।

শুভ কামনা রইল, আপনার জন্য, বিড়ালপাখির জন্য। ধন্যবাদ জিকো ভাই, মুল্যবান সময় দেয়ার জন্য। ভালো থাকবেন।

থাকব। আপনিও। বাসায় আসবেন।

আসব। আপনার রান্নার রুচিও ভালো হবে, সন্দেহ নাই। আরেকটা তকমা লাগানোর সুযোগ পাইলে মন্দ হয় না।:D

নাজমুল হক নাঈম, স্থপতি ও নির্মাতা

চলচ্চিত্রে সাহিত্য, আলোচিত ১৫

হৃদয় সাহা

বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসে 'সাহিত্য' বিশেষ স্থান দখল করে আছে। প্রথম সবাক চলচ্চিত্র মুখ ও মুখোশ ছিল সাহিত্যের চলচ্চিত্রায়ন। এই ৬০ বছরে অসংখ্যক সাহিত্যনির্ভর চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে। শুধু গল্প বা উপন্যাস নয়— কবিতা অবলম্বনেও সিনেমা নির্মিত হয়েছে। হয়েছে দর্শকনন্দিত, পেয়েছে পুরস্কৃত। সেই সুবাদে চলচ্চিত্রাঙ্গনে বাংলা সাহিত্যিকরা পেয়েছেন বিশেষ মর্যাদা। এমনকি শুরুর দিকে অনেক ঢাকাই সিনেমার সঙ্গে সাহিত্যিকরা যুক্ত ছিলেন।

বাংলা সাহিত্যের খ্যাতনামা ১৫ সাহিত্যিকের সৃষ্টির চলচ্চিত্ররূপ নিয়ে এই আয়োজন—

তিতাস একটি নদীর নাম (১৯৭৩) : প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক অদ্বৈত মল্লবর্মনের কালজয়ী উপন্যাস তিতাস একটি নদীর নাম অবলম্বনে দুই বাংলার যৌথ প্রযোজনায় সিনেমাটি নির্মান করেন ঋত্বিক ঘটক। এটি স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সাহিত্যনির্ভর চলচ্চিত্র। দর্শকপ্রিয় ও সমালোচকদের কাছে প্রশংসিত ছবিটি ব্রিটিশ ফিল্ম ইনস্টিটিউটের জরিপে বাংলাদেশি ছবির তালিকায় শীর্ষস্থান অর্জন করেছিল। ওস্তাদ বাহাদুর খানের সঙ্গীত ও বেবী ইসলামের অসামান্য চিত্রগ্রহণ ছবিটিকে অন্যরকম পূর্ণতা দিয়েছে। তিতাস নদীর পাড়ে ববসবাসরত জেলেপাড়ার মানুষদের জীবনযাত্রা নিয়ে নির্মিত এই ছবিতে অভিনয় করেছেন রোজি আফসারী, গোলাম মুস্তাফা, প্রবীর মিত্র, রানী সরকার, রওশন জামিল, কবরী প্রমুখ।

বসুন্ধরা (১৯৭৭) : আলাউদ্দিন আল আজাদের বিখ্যাত উপন্যাস তেইশ নম্বর তৈলচিত্র অবলম্বনে সুভাষ দত্ত নির্মাণ করেন সিনেমাটি। মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট নিবেদিত ছবিটি সেরা চলচ্চিত্র-সহ ছয়টি শাখায় জাতীয় পুরস্কার অর্জন করে। আলাউদ্দিন আল আজাদ পান সেরা কাহিনীকারের পুরস্কার। সত্য সাহার সঙ্গীতে এক তরুণ চিত্রকরের প্রদর্শনীতে এক অপূর্ব চিত্র নিয়ে আলোচিত হওয়া ঘটনাকে কেন্দ্র করে নির্মিত ছবিটিতে অভিনয় করেছেন ববিতা, ইলিয়াস কাঞ্চন, নূতন, সৈয়দ হাসান ইমাম-সহ অনেকে। এ সিনেমার মাধ্যমে ইলিয়াস কাঞ্চনের পর্দা অভিষেক হয়।

সারেং বউ (১৯৭৮) : শহীদ বুদ্ধিজীবী ও ঔপন্যাসিক শহীদুল্লাহ কায়সারের বিখ্যাত উপন্যাস সারেং বউ অবলম্বনে সিনেমাটি নির্মাণ করেন আবদুল্লাহ আল মামুন। সেরা অভিনেত্রী বিভাগে জাতীয় পুরস্কার পাওয়া ছবিটি দর্শক ও সমালোচকদের দৃষ্টিতে বাংলা চলচ্চিত্রের কালজয়ী নির্মাণ হিসেবে স্থান পেয়েছে। আলম খানের সঙ্গীতে বাংলার কোন এক গ্রামে সারেং বউ নবিতনের জীবন সংগ্রাম ফুটে উঠেছে দারুণভাবে। অভিনয় করেছেন কবরী, ফারুক, আরিফুল হক প্রমুখ।

সূর্য দীঘল বাড়ী (১৯৭৯) : আবু ইসহাকের বিখ্যাত উপন্যাস অবলম্বনে সিনেমাটি যৌথভাবে নির্মাণ করেন মসিউদ্দিন শাকের ও শেখ নিয়ামত আলী। যা বাংলাদেশের প্রথম সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র। একাধিক আর্ন্তজাতিক পুরস্কার পাওয়ার পাশাপাশি সেরা চলচ্চিত্র-সহ ৭টি শাখায় জাতীয় পুরস্কার অর্জন করে ছবি। আবু ইসহাক পান সেরা কাহিনীকারের পুরস্কার। জয়গুন নামের এক গ্রাম্য মায়ের সন্তানসহ জীবন সংগ্রাম সাথে কিছু কুসংস্কার ফুটে ওঠা এই ছবিতে অভিনয় করেছেন ডলি আনোয়ার, রওশন জামিল, ইলোরা গওহর ও এটিএম শামসুজ্জামান।

দেবদাস (১৯৮২) : অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জনপ্রিয় উপন্যাস অবলম্বনে সিনেমাটি নির্মাণ করেন চাষী নজরুল ইসলাম। জমিদার পুত্র ও সাধারণ কন্যার বিয়োগাত্মক প্রেম, পাশাপাশি এক বাঈজীর ভালোবাসা— সার্থকভাবে ফুটে ওঠা এই ছবিতে অভিনয় করেছেন বুলবুল আহমেদ, কবরী, আনোয়ারা, রহমান-সহ অনেকে।

শঙ্খনীল কারাগার (১৯৯২) : হুমায়ূন আহমেদের শঙ্খনীল কারাগার' অবলম্বনে সিনেমাটি নির্মাণ করেন মুস্তাফিজুর রহমান। বাংলাদেশ টেলিভিশন প্রযোজিত ছবিটি দর্শক ও সমালোচক প্রিয়। আন্তর্জাতিক পুরস্কারের পাশাপাশি সেরা চলচ্চিত্র-সহ চারটি জাতীয় পুরস্কার লাভ করে। হুমায়ূন আহমেদ ও অর্জন করেন সেরা কাহিনীকারের স্বীকৃতি। এক মধ্যবিত্ত সাধারণ পরিবারের সুখ-দুঃখ, জীবনযাত্রা অসাধারণভাবে ফুটে ওঠেছে এই ছবিতে। প্রধান কয়েকটি চরিত্রে অভিনয় করেছেন ডলি জহুর, আসাদুজ্জামান নূর, চম্পা, সুবর্ণা মুস্তাফা, নাজমা আনোয়ার ও মমতাজউদ্দিন আহমেদ।

পদ্মা নদীর মাঝি (১৯৯৩) : মানিক বন্দোপাধ্যায়ের কালজয়ী উপন্যাস অবলম্বনে দুই বাংলার যৌথ প্রযোজনায় সিনেমাটি নির্মাণ করেন গৌতম ঘোষ। ছবিটি দুই দেশের দর্শক-সমালোচকদের প্রিয়। ভারতের জাতীয় পুরস্কারে সেরা বাংলা ছবির পুরস্কার পাওয়ার পাশাপাশি বাংলাদেশে সেরা চলচ্চিত্র-সহ ৫টি শাখায় পুরস্কার লাভ করে। পদ্মা পাড়ের জেলেদের জীবনযাত্রা ফুটে ওঠা এই ছবিতে অভিনয় করেছেন রাইসুল ইসলাম আসাদ, চম্পা, রূপা গাঙ্গুলি, উৎপল দত্ত-সহ অনেকে।

দীপু নাম্বার টু (১৯৯৬) : মুহম্মদ জাফর ইকবালের জনপ্রিয় কিশোর উপন্যাস অবলম্বনে সরকারি অনুদানে সিনেমাটি নির্মাণ করেন মোরশেদুল ইসলাম। এটি বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় শিশুতোষ চলচ্চিত্র। দর্শক-সমালোচক প্রিয় ছবিটি দুটি বিভাগে জাতীয় পুরস্কার লাভ করে। কিশোর বয়সের সম্পর্কের টানাপোড়েন, বন্ধুত্ব, কৌতুহল সবকিছুই অসাধারণভাবে ফুটে ওঠা ছবিটিতে অভিনয় করেছেন বুলবুল আহমেদ, ববিতা, অরুন সাহা- সহ অনেকে।

হাঙর নদী গ্রেনেড (১৯৯৭) : কথাশিল্পী সেলিনা হোসেনের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস অবলম্বনে সরকারি অনুদানে সিনেমাটি নির্মাণ করেন চাষী নজরুল ইসলাম। একই উপন্যাস অবলম্বনে সিনেমা নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন আলমগীর কবির। চাষীর ছবিটি বাংলা চলচ্চিত্রে বিশেষ স্থান করে নিয়েছে। সেরা অভিনেত্রী-সহ ৩টি শাখায় জাতীয় পুরস্কার লাভ করে। সেলিনা হোসেন অর্জন করেন সেরা কাহিনীকারের পুরস্কার। একজন সাধারণ গ্রাম্য মায়ের চোখে সন্তান, দেশ, স্বাধীনতা অসাধারণভাবে ফুটে ওঠা এই ছবিতে অভিনয় করেছেন সুচরিতা, সোহেল রানা, অরুনা বিশ্বাস, রাজিব-সহ অনেকে।

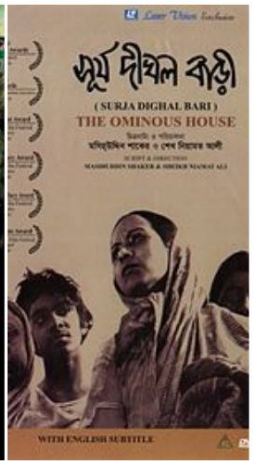

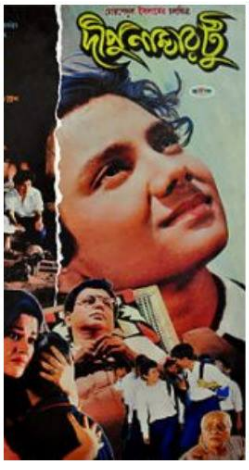

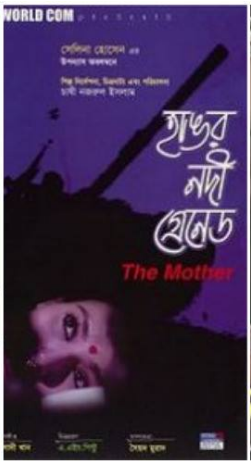

লালসালু (২০০১) : সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর উপন্যস অবলম্বনে সিনেমাটি নির্মাণ করেন তানভীর মোকাম্মেল। ছবিটি সেরা চলচ্চিত্র-সহ ৯টি শাখায় জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার লাভ করে। ওয়ালীউল্লাহ অর্জন করেন সেরা কাহিনীকারের জাতীয় পুরস্কার। গ্রাম্য সমাজে ধর্মীয় কুসংস্কারকে উপজীব্য করে গল্প এসেছে এ সিনেমায়। অভিনয় করেছেন রাইসুল ইসলাম আসাদ, মুনিরা ইউসুফ মেমী, চাঁদনী, তৌকীর আহমেদ প্রমুখ।

জয়যাত্রা (২০০৪) : চলচ্চিত্রকার ও সাহিত্যিক আমজাদ হোসেনের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস অবেলায় অসময় অবলম্বনে তৌকীর আহমেদ নির্মাণ করেন জয়যাত্রা।
ছবিটি সেরা চলচ্চিত্র-সহ ৭ বিভাগে জাতীয় পুরস্কার লাভ করে। মুক্তিযুদ্ধের সময় নৌকায় করে মুক্ত আবাসস্থলের খোঁজে যাওয়া একদল মানুষের সুখ-দুঃখ, ভালোবাসা সর্বোপরি স্বাধীনতার স্বপ্ন ফুটে ওঠা এই ছবিতে অভিনয় করেছেন বিপাশা হায়াত, মাহফুজ আহমেদ, আজিজুল হাকিম, চাঁদনী, নাসিম, হুমায়ূন ফরীদি, আবুল হায়াত-সহ অনেকে।

হাজার বছর ধরে (২০০৫) : ঔপন্যাসিক ও নির্মাতা জহির রায়হানের কালজয়ী উপন্যাস অবলম্বনে সরকারি অনুদানে সিনেমাটি নির্মাণ করেন কোহিনূর আক্তার সুচন্দা। আর্ন্তজাতিক অঙ্গনে পুরস্কার পাওয়ার পাশাপাশি ছবিটি সেরা চলচ্চিত্র-সহ ৭টি শাখায় জাতীয় পুরস্কার লাভ করে। সেরা কাহিনীকারের পুরস্কার অর্জন করেন জহির রায়হান। গ্রাম বাংলার আবহমান জীবনধারা, মূল্যবোধ, সম্পর্ক অসাধারণভাবে ফুটে ওঠা এই ছবিতে অভিনয় করেছেন রিয়াজ, শশী, এটিএম শামসুজ্জামান, শাহনূর, নাজমা আনোয়ার প্রমুখ।

শাস্তি (২০০৫) : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটগল্প শাস্তি অবলম্বনে সিনেমাটি নির্মাণ করেন চাষী নজরুল ইসলাম। এটি ছিল বাংলাদেশি চলচ্চিত্রে প্রথম রবীন্দ্র সাহিত্যের চলচ্চিত্ররূপ। ছবিটি একাধিক শাখায় জাতীয় পুরস্কারও লাভ করে। জমিদার শাসিত সমাজে এক নিম্নবিত্ত পরিবারের ভ্রাতৃত্ববোধ ও নারীর আত্মসম্মানের গল্পে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন রিয়াজ, পূর্ণিমা, চম্পা ও ইলিয়াস কাঞ্চন।

বাঙলা (২০০৬) : বুদ্ধিজীবী আহমদ ছফার উপন্যাস ওঙ্কার অবলম্বনে জনপ্রিয় নির্মাতা শহিদুল ইসলাম খোকন নির্মাণ করেন ছবিটি। ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে এক বোবা মেয়ের আকাঙ্ক্ষা, স্বাধীনতার স্বপ্ন ফুটেছে এই ছবিতে। অভিনয় করেছেন শাবনূর, মাহফুজ আহমেদ, হুমায়ূন ফরীদি-সহ অনেকে।

হৃদয় সাহা : চলচ্চিত্র বিষয়ক লেখক

যৌথ প্রযোজনা : এক ফেনসিডিলের নাম

আবদুল্লাহ আল-মানী

খুব অবাক হচ্ছেন শিরোনাম পড়ে? অবাক হওয়ারই কথা, চলচ্চিত্রের সাথে ফেনসিডিলের সংমিশ্রণ কী করে! আচ্ছা ঠিক আছে, খানিক বাদে না হয় সে কথা আলোচনা হবে। তার আগে ফেনসিডিল সম্পর্কে একটু জেনে আসি।

ফেনসিডিল কী? এক ধরনের ঔষধ; কাশির ঔষধ। এতে থাকে codeine phosphate, pseudoephedrine ও chlorpheniramine maleate। সাধারণত ইন্ডিয়া, নেপাল ও বাংলাদেশের লোকদের মাঝে এর আসক্তি দেখা যায়। তবে বাংলাদেশেই সেবন খুব বেশি।

এবার ফিরে আসি মূল কথায়, মানে বাংলা চলচ্চিত্রে। বাংলা চলচ্চিত্রের আকাশে বেশ কয়েকবছর ধরেই যৌথ প্রযোজনার ঢাকঢোল শোনা যাচ্ছে। বড় সিনেমা মানেই যৌথ প্রযোজনা। কেউ কেউ তো বলেই দিচ্ছেন যৌথ প্রযোজনা ছাড়া মানসম্মত সিনেমা তেমন হয় না। আচ্ছা, তর্কের খাতিরে সে কথা মেনে নিলাম। ঠিক যেমন মেনে নিয়েছি 'ফেনসিডিল' কাশির উপশমকারী সিরাপ। যার অত্যধিক ব্যবহার যেমন একে নেশাদ্রব্যে পরিণত করছে, সেভাবে যৌথ প্রযোজনার লাগামহীন প্রয়োগ ও অপনীতি একে দেশের চলচ্চিত্র শিল্পে নেশাদ্রব্যের বস্তুতে পরিণত করছে। বস্তুত ভালো দিকে ব্যবহারের জন্য নীতি নির্ধারণ করা হলেও, ফেনসিডিলের মতো মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহারে যৌথ প্রযোজনা 'চলচ্চিত্র আগ্রাসন ব্যাধি' নামে পরিচিত হচ্ছে।

আমাদের চলচ্চিত্র শিল্প একসময় খুব মানসম্মত ছিল। ৭০, ৮০, ৯০ দশক এমনকি বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেও আমাদের চলচ্চিত্রের সুদিন ছিল। ছিল ১০০০ এর উপর হল, মানসম্মত দর্শক, ভালো পরিচালক ও নিখুঁত গল্পের বুনন। সময়ের পরিক্রমায় ও অশ্লীলতার জোয়ারে আমাদের বহুদিনের চলচ্চিত্র ইতিহাস কয়েক বছরে মৃতপ্রায় হয়ে পড়ে। আসলে বাস্তবতা এমনই— দুর্যোগ যখন আসে তখন সবকিছু বিলীন করে দিয়ে যায়, যেখান থেকে কাটিয়ে ওঠা অনেক সময় সাপেক্ষ ব্যাপার হলেও অসম্ভব কিছু নয়।

সোনালী যুগের দিনগুলো মনে করা যায়, স্মৃতিচারণ করা যায়, তাই বলে সোনালী অতীত আকড়ে পড়ে থাকলে উন্নতি হবে না। একটা ইন্ডাস্ট্রি কীভাবে উন্নত করতে পারে তার অন্যতম উদাহরণ মোচওয়ালা, ভুড়িওয়ালা বলে আমাদের দেশের লোকেরা যাদের সিনেমা দেখে নাক সিটকায় সেই সাউথ ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রি (তামিল, তেলুগু, মালায়ালাম ও কন্নড়)। তারা গ্ল্যামারের থেকেও বেশি

মনোযোগ দেয় গল্পে, কারণ কাহিনীই সিনেমার প্রাণ। বাদ দিলাম সে কথা— টালিগঞ্জ ইন্ডাস্ট্রির কথা বলি মানে আমাদের মা-বোনের প্রাণের কলকাতা বাংলা সিনেমার কথা। বহুকাল আগে যখন আমাদের এখানে মানসম্মত সিনেমা হতো, তখন সেখানে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় প্রতিনিয়ত ইন্ডাস্ট্রিকে টিকিয়ে রাখার জন্য একের পর এক সিনেমা করে গেছেন। বেহাল অবস্থা যাকে বলে ঠিক তাই ছিল কিন্তু সেখান থেকে তারা উঠে এসেছেন, সেই প্রসেনজিৎ এখনো সিনেমা করেন কিন্তু তার সময়ে কিংবা তার পরে আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে যারা এসেছেন তাদের অনেকেই এখন চলচ্চিত্র জগৎ থেকে অনেক দূরে চলে গিয়েছেন। ব্যর্থ হয়েছি আমরা, উন্নত হয়েছে টালিগঞ্জ।

তাদের ওখানে যখন নির্মিত হয়েছে ডিজিটাল সিনেমা তখনো আমাদের এখানে চলেছে ৩৫ মি.মি.-এর ছবি। তাদের সিনেমা হলগুলো ভেঙে মাল্টিপ্লেক্স হয়েছে, সিনেপ্লেক্স হয়েছে কিন্তু আমাদের হলগুলো হারিয়ে গেছে। আমরা সিনেমা হল হারিয়েছে কিন্তু জামা-কাপড় কেনার জন্য মল মানে শপিং মল পেয়েছি। শুধু মাঝ দিয়ে সংস্কৃতি প্রদর্শনের স্থান হারিয়েছি। আমরা প্রযুক্তির সাথে এগিয়ে যেতে পারিনি; তারা এগিয়েছে, উন্নত করেছে তাদের চলচ্চিত্র শিল্পকে। মানছি তারাও সর্বভারতীয় সিনেমার প্রেক্ষিতে কোনটাসা নানা কারণে, তা সত্ত্বেও এগিয়ে যাওয়াটা চোখে পড়ার মতোই।

আমাদের চলচ্চিত্র শিল্পের এরূপ বেহাল অবস্থা থেকে মুক্তির পথ প্রদর্শন করল তথাকথিত যৌথ প্রযোজনা। সিনেমার কোয়ালিটি ও নির্মাণশৈলী বাড়লেও কাহিনীতে তেমন বৈচিত্র আসেনি। কপি বা নকল সিনেমা দিয়ে এসব যৌথ প্রযোজনা নির্মিত হলেও বাংলাদেশের কিছু মানুষকে হলমুখী করতে পেরেছে। যৌথ প্রযোজনার একটি ভালো দিক হলেও তার খারাপ দিকগুলো কিছু বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর মানুষের চোখে ধরা পড়ছে। লেখার শুরুতে বলেছিলাম ফেনসিডিলের কথা, কাশির ঔষধ হিসাবে ব্যবহার শুরু হলেও পরে মানুষ ব্যবহার শুরু করে নেশাদ্রব্য হিসাবে, ঠিক তেমনি বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের উন্নয়নের জন্য যৌথ প্রযোজনা পরোক্ষভাবে কাজ করার কথা থাকলেও তার ছিটেফোঁটাও দেখা যাচ্ছে না। ফেনসিডিলের মতো দেশের চলচ্চিত্র অঙ্গনের স্বকীয়তা নষ্ট করছে। শুধুমাত্র যৌথ প্রযোজনার জন্য অনেকে দেশের পরিচালকদের ছোট করছেন, নিজের ইমেজ নষ্ট করছেন, বিতর্কিত কথার জন্ম দিচ্ছেন। অনেকটা নিজের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর মতো অবস্থা। ভুলে যাচ্ছেন নিজের শেকড়ের কথা, কেউ কেউ আবার যৌথ প্রযোজনার পক্ষ নিয়ে কথা বলে নিজেকে দালাল হিসাবে জনগণের কাছে উপস্থাপন করছেন।

যৌথ প্রযোজনার মধ্যে দিয়ে সব থেকে বিতর্কের জন্ম দিয়েছে জাজ মাল্টিমিডিয়া। তাদের কাজ ও কথার মধ্যে অনেক পার্থক্য দেখা গিয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে, জাজ বাংলাদেশে কলকাতার সিনেমার ডিস্ট্রিবিউটর। একথা বলার সুযোগ জাজ নিজেই করে দিয়েছে। কারণ হিসাবে যদি আমরা তাকাই তাহলে দেখতে পাবো— ১৯৮৬ সালের নীতিমালায় বলা আছে, যৌথ প্রযোজনার ছবি নির্মাণে নির্মাতা, শিল্পী, কলাকুশলী দুদেশ থেকে সমহারে থাকতে হবে। দু'দেশে শুটিং হতে হবে। কিন্তু ২০১২ সালের পরিবর্তিত নীতিমালায় উল্লেখ আছে দুদেশের নির্মাতা আলোচনার ভিত্তিতে সব বিষয় চূড়ান্ত করবে। আসলে এটি শুভঙ্করের ফাঁকি ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে নায়ক বা নায়িকা ছাড়া মুখ্য চরিত্রে বাংলাদেশের কাউকে খুঁজে পাওয়া যায় না, সেখানে সমহার চিন্তা করাতো অনেক দূরের কথা। আবার এদেশের বাজার ধরার জন্য কোন কোন ক্ষেত্রে আমাদের দেশের নায়ক দিয়ে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করিয়ে একই সাথে মুক্তি না দিয়ে বাংলাদেশে আগে ও ভারতে পরে মুক্তি দেওয়া হয়। হিসাবটাও খুব সোজা, যৌথ প্রযোজনার অধিকাংশ সিনেমার অর্থ লগ্নির বেশির ভাগ করা হয়েছে ওপার থেকে, তাই এদেশের নায়কের সিনেমা ওপারে বেশি না চললেও বাংলাদেশে ঠিকই চলবে।

মাঝ দিয়ে ভারতীয় প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান ও তাদের অন্য কলাকুশলীরা আর্থিকভাবে লাভবান হলো। একই সাথে তাদের ব্র্যান্ডিং ও অর্থ উপার্জন দুই থাকল।

আবার কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের প্রধান নায়ক-নায়িকার সিনেমা আমাদের দেশে যৌথ প্রযোজনার সিনেমা হিসাবে চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে (আমি শুধু চেয়েছি তোমায়, প্রেম কি বুঝিনি, বস টু)। এতে সুবিধা কী? এক্ষেত্রে সুবিধা দ্বিগুণ বলা যায়। কারণ মূল অর্থ লগ্নিকারী কে, সেটা কেউ জানে না। একই সাথে পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশে সিনেমা রিলিজ হয়, আমাদের দেশের মানুষের কাছে ওপারের নায়কেরা বেশ জনপ্রিয়, তারা হুমড়ি খেয়ে পড়ে সিনেমা হলে। ওপারে যা ইনকাম হয় তার থেকে কোন অংশে কম ইনকাম বাংলাদেশ থেকে হয় না। ফলাফল আবারো তাদের দেশের প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান আর্থিকভাবে লাভবান হয়। এবার যদি বলেন তাহলে আমাদের দেশের প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানের কি কোন লাভ নেই? লাভ ছাড়া কেউ কোন কাজ করে না, সুতরাং তার লাভ আছে। কিন্তু তার লাভ দিয়ে বাংলা ইন্ডাস্ট্রির কোন উন্নতি হচ্ছে না, এখনো সেই রুচিহীন গল্প কিংবা জোড়াতালি গল্পের সিনেমা চলছে। তাহলে যৌথ প্রযোজনা দিয়ে আমাদের লাভ কী হল? মাঝ দিয়ে দেশের অর্থ অন্যখানে চলে যাচ্ছে, অন্য ইন্ডাস্ট্রি উন্নত হচ্ছে। আর আমরা সেই পূর্বের অবস্থাতে রয়ে গেছি। বরং নিম্ন থেকে নিম্নতর অবস্থায় যাচ্ছি, না হলে আমাদের আর একটা মনপুরা তৈরি হতো, আরো অনেকগুলো আয়নাবাজি, জিরো ডিগ্রী নির্মিত হতো।

যৌথ প্রযোজনা প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করার পরিবর্তে প্রতিযোগিতার মনোভাব নষ্ট করে দিচ্ছে। তার উপর রয়েছে হল নিয়ে রাজনীতি, যৌথ প্রযোজনা হল টিকিয়ে রেখেছে এমন বলা হয়ে থাকলেও আজ পর্যন্ত একটা নতুন হল নির্মাণের কথা শোনা গেল না, উপরন্তু কারওয়ানবাজারের পূর্ণিমা হল এখন বন্ধ! ব্যাপারটা অনেকটা এমন, যারা ফেনসিডিল খায় তারা প্রথমে এক্সপেরিমেন্ট হিসাবেই শুরু করে, এরপর যখন এর মাদকতা পায় তখন শুরু করে নিয়মিত সেবন। কারণ ফেনসিডিলের প্রভাব যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ সে পৃথিবীর অন্যতম সুখী মানুষ। কিন্তু এর ক্ষতিকর দিক হচ্ছে, শরীর দুর্বল হয়ে যাওয়া, রুচি নষ্ট হওয়া, এবডোমিনাল পেইন, হার্টবিট বেড়ে যাওয়া এবং একটা সময় মানসিকভাবেই অসুস্থ হয়ে যায়। যে কোন কাজের প্রতিই তাদের আগ্রহ কমে যায়। যার ফলশ্রুতিতে দেখা যায়, ফেনসিডিলখোরদের চাকরি চলে যায়, ব্যবসা ধ্বংস হয়ে যায়। যৌথ প্রযোজনাও ঠিক ফেনসিডিলের মতো, প্রথমে খুব ভালো লাগবে এক্সপেরিমেন্ট হিসাবে কিন্তু কখন এটি আকর্ষণ তৈরি করে মোহাচ্ছন্ন করে ফেলবে আমাদের দেশের আমজনতা তা বুঝতেও পারবে না। মাঝখান দিয়ে দেশের চলচ্চিত্র শিল্পের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে যাবে, ধ্বংস হয়ে যাবে স্বতন্ত্র চলচ্চিত্র।

মূলত অর্থ পাচারের জন্যই ছবিগুলোর বাংলাদেশি ভার্সনে যৌথ প্রযোজনা নাম দেয়া হয়। অর্থ পাচারে এর থেকে ভালো কোন উপায় এখন পর্যন্ত আবিস্কৃত হয়নি। তারা আমাদের শিল্পীদের নামে মাত্র কাস্টিং করেন এদেশে বাজার ধরার জন্য। এখানে সংস্কৃতির কোন বিনিময় হচ্ছে না, হচ্ছে শুধু ব্যবসা।

অঞ্জন দত্ত এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, "পশ্চিমবঙ্গের সিনেমা ব্যবসা 'হুমকি' র মুখে পড়েছে। তামিল ও হিন্দি সিনেমার প্রতিই ঝুঁকছে পশ্চিমবঙ্গের দর্শক। তাই তাদের অনেকের নজর বাংলাদেশের বাজারে।"

এ মন্তব্য অনুধাবন করলেই বোঝা যাবে বাংলাদেশের দর্শকদের প্রতি কলকাতার নির্মাতাদের আগ্রহ ও নজর কতটুকু। সরাসরি বাংলাদেশের বাজারে প্রবেশ করতে না পারা এসব নির্মাতারা এক প্রহসনমূলক নিয়মের আশ্রয় নিচ্ছেন। যার নাম 'যৌথ প্রযোজনা'।

যৌথ প্রযোজনার সিনেমার ট্রেলারের দুই দেশের ইউটিউব ও সোশ্যাল মিডিয়ার পেজে দুই দেশের পরিচালক, প্রযোজক, সংগীতশিল্পীদের নাম থাকবে এমনি আশা করে সবাই। কিন্তু বাস্তবতা হল অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অংশে দুই দেশের নাম থাকলেও ভারতীয় অংশে থাকে না। এমনভাবে ট্রেলার বা পোস্টার প্রচার করা হলে কী করে যৌথ প্রযোজনা হয় তা কোনভাবেই বোধ্যগম্য নয়। আমাদের চোখে কালো চশমা পরিয়ে বিশ্ব চলচ্চিত্রে বাংলাদেশি নায়কদের পরিচিতি বাড়ানোর লোভ দেখিয়ে চলচ্চিত্র শিল্পকে ধ্বংসের নীল নকশা আমাদের অজান্তে এঁকে ফেলা হচ্ছে। কারণ যৌথ প্রযোজনার যাদের হাত ধরে নবজাগরিত হলো, তাদের মুখে এখন শুনতে হয়—

'ব্যবসা করতে এসেছি, শিল্প চর্চা করতে নয়'

এরূপ বাণী দেওয়া গোষ্ঠীকেও সাপোর্ট দিয়ে এসেছে অনেকে যেন ২-৩টা দেশি সিনেমা দেখতে পারে। সেই আশায় গুড়েবালি, যখন দেখে তারা যৌথ প্রযোজনার নাম করে অত্যন্ত সুকৌশলে ভারতীয় ডিস্ট্রিবিউটর হিসেবে কাজ করছে। কলকাতা দখল করতে গিয়ে হয়তো দেশের শিল্পটা বেচে দিয়ে আসছেন। সেখানে সাথে পাচ্ছেন দেশের সবচেয়ে দামী তারকাদের। তখন আসলেই মন থেকে বের হয়ে আসে—

'কবে এই কফিনে শেষ পেরেক ঠুকা হবে।'

যখন বাংলাদেশের চলচ্চিত্র বলে কিছু থাকবে না তখন এ শিল্প ধ্বংস হওয়ার গোপন রহস্য কেউ জানবে না, বুঝতেও পারবে না আমরা নিজেদের পায়ে কীভাবে নিজেরা কুড়াল মেরেছি। এতকিছুর পর একটু হলেও কয়েকটা অজ্ঞাতনামা, আয়নাবাজি, মনপুরা, টেলিভিশন, জিরো ডিগ্রী হচ্ছে যেগুলোতে বাংলার ঘ্রাণ পাওয়া যায়। উচ্চ বাক্যে বলা যায় এটা শুধু আমাদের ছবি, আমাদের অস্তিত্বের ছবি। আসুন নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখি, চলচ্চিত্র শিল্প বাঁচায়। সঠিক যৌথ প্রযোজনা চাই, স্বচ্ছ যৌথ প্রযোজনা চাই। ফেনসিডিলরূপী যৌথ প্রযোজনার প্রহসনকে রুখে চলচ্চিত্র শিল্পকে রক্ষা করি।

আবদুল্লাহ আল-মানী : চলচ্চিত্র-সহ নানা বিষয়ে লেখালেখি করেন।

ঈদের সিনেমা খুঁজতে গিয়ে কলকাতা ঘুরে এলাম

রোদেলা নীলা

দুই ঈদকে সামনে রেখে সারাবছর চলতে থাকে সিনেমার শুটিং আর আমাদের মতো অতি উৎসাহী দর্শক হা করে অপেক্ষা করে থাকে। বাংলাদেশে আলাদাভাবে কোন সিনেমার গাইড নেই যেখানে লেখা থাকবে— কোন হলে কোন কোন সিনেমা মুক্তি পাচ্ছে, উল্লেখ করা নেই ছবি পরিচালক বা শিল্পীদের নাম। তাই বাধ্য হয়েই পত্রিকার ওপর ভরসা করতে হয়। আর এ লেখার লক্ষ্যও বিনোদন পাতায় কী খুজেঁ পেলাম।

প্রথম সারির পত্রিকাগুলোর বিনোদন পাতা যথাক্রমে বলিউড, হলিউড ও ঢালিউড— এই তিন ক্যাটাগরিতে নিউজ আপডেট করছে। মজার বিষয় হচ্ছে কলকাতার বাংলা সিনেমার জন্য আলাদা সেগমেন্ট নেই। কারণ, ওপার বাংলার সব সিনেমার খবর ঢালিউড পাতায় পাওয়া যায়। যৌথ প্রযোজনা সিনেমার মতোই এর নাম দেওয়া যাক— যৌথ নিউজ। ওদের দেশের প্রায় সব সিনেমার নিউজ আমাদের পত্রিকাওয়ালারা খুব ঘটা করেই দিচ্ছেন। আর না দিয়ে উপায় তো নেই, ঈদের প্রায় সব ছবিই যৌথ উদ্যোগে নির্মিত।

একটি তরতাজা বাংলাদেশের সিনেমা দেখব বলে হন্য হয়ে গুগল সার্চ দিই, কারণ পত্রিকাগুলোতে কেবল নুসরাত ফারিয়ার 'আল্লাহ মেহেরবান' গানের ওপর উকিল নোটিশের বৃত্তান্ত। দেশের কোন তারকার সফলতার গল্প তেমন নেই বললেই চলে। বার বার তাই প্রশ্ন জাগে— এই যে এত এত অভিনয়শিল্পী-পরিচালক, এফডিসি-তে ভোটাভুটি আসলে কিসের জন্য?

ঈদের সিনেমা খুঁজতে গিয়ে অনুসন্ধানী চোখ যা পেল
ঈদের ছবি হিসেবে সব চাইতে আগে যে নামটা চোখে পড়েছে তা হচ্ছে নবাব। জাজ মাল্টিমিডিয়া ও কলকাতার এসকে মুভিজের যৌথ প্রযোজনায় শাকিব খানের বিপরীতে আছেন শুভশ্রী গাঙ্গুলি। পরিচালনা করেছেন জয়দীপ মুখার্জি।

'আল্লাহ মেহেরবান' গানটিকে অশ্লীলভাবে প্রদর্শনের জন্য দায়ী সিনেমার নাম বস টু, যা কিনা ২০১৩ সালে কলকাতায় মুক্তি পাওয়া বস-এর সিক্যুয়াল। বাবা যাদব পরিচালিত ছবিটিতে আছেন জিৎ, নুসরাত ফারিয়া ও শুভশ্রী গাঙ্গুলি। প্রযোজনা করছে জাজ ও গ্রাসরুট এন্টারটেইনমেন্ট।
ভারতের শ্রী ভেঙ্কটেশ ফিল্মসের ঢাকা অফিস প্রযোজনা করছে রংবাজ। শামীম আহমেদ রনি ও আবদুল মান্নানের পরিচালনায় অভিনয় করেছেন শাকিব খান ও শবনম বুবলি। আরো আছে বুলবুল বিশ্বাস পরিচালিত ও শাকিব-অপু বিশ্বাসের রাজনীতি।

আওয়াজ দেওয়া সিনেমার মধ্যে ছিল অহংকার। যাতে শাকিবের নায়িকা শবনম বুবলি। সৈকত নাসির পরিচালিত পাষাণ-এ অভিনয় করেছেন কলকাতার ওম ও ঢাকার বিদ্যা সিনহা মীম। প্রযোজনা করছে জাজ মাল্টিমিডিয়া।

মাহির বিপরীতে মনে রেখো-তে অভিনয় করেছেন কলকাতার বনি সেনগুপ্ত। পরিচালনায় আছেন ওয়াজেদ আলী সুমন। প্রযোজনা করেছে হার্টবিট প্রোডাকশন।

কলকাতার প্রোডাকশন হিসেবে শ্রী ভেঙ্কটেশের নাম ঠিক না হওয়া একটি ছবি শেষ করেছেন শাকিব। রাজীব পরিচালিত ছবিটিতে নায়িকা হিসেবে আছেন সায়ন্তিকা ও নুসরাত জাহান।

উপরের তথ্য অনুযায়ী স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশে শাকিব-অপু-বুবলি এই তিন তারকা ছাড়া আর কোন শিল্পীই (মীম ছাড়া) নেই। অবশ্য গেল দুই মাসে এই তিন তারকা বাংলাদেশের সমস্ত দর্শককে যেভাবে টেলিভিশন দেখাতে বাধ্য করেছিলেন তেমনি যদি সব দর্শকদের হলে গিয়ে বাংলা সিনেমাও দেখাতে পারেন তাহলে কিন্তু হল মালিকদের পোয়াবারো।

এরপরও প্রশ্ন থেকে যায়, বাংলাদেশে কি এককভাবে কোন সিনেমা হচ্ছে না যেখানে শিল্পী থেকে সব কলাকুশলী কেবলই বাংলাদেশি। উত্তর খতিয়ে দেখতে গিয়ে কিছু বাংলা সিনেমা পাওয়া গেছে, যা এখনো সেন্সর বোর্ডে আটকে আছে।

রাজিবুল হোসেনের অ্যাডভেঞ্চারভিত্তিক চলচ্চিত্র হৃদয়ের রংধনু আটকে দেওয়া হয়েছে। কয়েকটি কারণ উল্লেখ করে বলা হয়েছে সিনেমাটি পর্যটন শিল্পের জন্য ক্ষতির কারণ হতে পারে। আরো বলা হয়, ছবিতে একই সংলাপ একাধিকবার একই সময়ে বা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ব্যবহার, অর্থহীন সংলাপের ব্যবহার ও নিম্নমানের অভিনয় দর্শকদের বিরক্তির উদ্বেগ করতে পারে।

বাংলাদেশে চাকমা ভাষায় নির্মিত প্রথম চলচ্চিত্র মর থেঙ্গারি বা মাই বাইসাইকেল নিয়ে আপত্তি জানিয়েছে সেনাবাহিনী। তাই ছবিটি শেষ পর্যন্ত সেন্সর বোর্ড পেরিয়ে প্রদর্শনের অনুমতি পায়নি। পরিচালক অং রাখাইন মাই বাইসাইকেল-এর জন্য গত দশ বছর ধরে কাজ করলেও ছবির দৃশ্যধারণ শুরু করেন ২০১২ সালে। এরপর ২০১৪ সালের ডিসেম্বর মাসে ঢাকার একটি চলচ্চিত্র উৎসবে প্রথম প্রদর্শিত হয় মর থেঙ্গারি। কিন্তু দেশের কোন প্রেক্ষাগৃহে এখনো সিনেমাটি প্রদর্শিত হয়নি। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে জগতের সমস্ত সেন্সর বাংলা সিনেমায় এসে ঠেকেছে। কী চাচ্ছে এই সেন্সর বোর্ড?

এই বছর বেশ ঘটা করেই চলচ্চিত্র নির্মাণের একটি নীতিমালা করা হয়েছে। এক নজরে তা দেখে আসি —

জাতীয় চলচ্চিত্র নীতিমালা ২০১৭
১. চলচ্চিত্রে সরাসরি ধর্ষণের দৃশ্যসহ নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা, বৈষম্যমূলক আচরণ বা হয়রানিমূলক কর্মকাণ্ডকে উদ্বুদ্ধ করে এমন দৃশ্য প্রদর্শন নিষিদ্ধ।
২. সেন্সর বোর্ডের নাম পরিবর্তে হয়েছে সার্টিফিকেশন বোর্ড।

৩. কোনো চলচ্চিত্রেই রাষ্ট্র ও জনস্বার্থবিরোধী বক্তব্য প্রচার করা যাবে না। সমুন্নত রাখতে হবে মুক্তিযুদ্ধ, ইতিহাস ও তথ্যের বস্তুনিষ্ঠতা; পরিহার করতে হবে অশ্লীল ও কুরুচিপূর্ণ ভাষা।

৪. কোনো অশোভন উক্তি, আচরণ এবং অপরাধীদের কার্যকলাপের কৌশল প্রদর্শন, যা অপরাধ সংঘটনের ক্ষেত্রে নতুন পদ্ধতির প্রবর্তন ও মাত্রা আনতে সহায়ক হতে পারে, এমন দৃশ্য পরিহার করতে হবে।

৫. চলচ্চিত্রের সংলাপে অশ্লীল ও কুরুচিপূর্ণ ভাষা পরিহার করতে হবে।

উপরে উল্লিখিত নীতিমালার ভয়েই কিনা জানিনা, বাংলাদেশের পরিচালকরা সিনেমায় টাকা লগ্নি করা প্রায় বন্ধই করে দিয়েছেন। নতুন চিত্রনাট্যকারদের সমাজের সব নেতিবাচক ঘটনা এড়িয়ে গল্প লিখতে হবে, এর চাইতে ঢের ভালো তামিল সিনেমা কপি করে দিয়ে যৌথ প্রযোজনায় যাওয়া যাতে কোনভাবেই পরিচালকের সেলুলয়েড ফিতেয় সেন্সরের কাঁচির দখলে না পড়ে।

২০১৫ সাল থেকে বাংলাদেশ তথ্য মন্ত্রণালয় বলে আসছে, সরাসরি ইংরেজি নাম নয়, কিছু ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ছাড়া বাংলাদেশি সিনেমার নাম দিতে হবে বাংলাতেই। বাংলা চলচ্চিত্রে ঢালাওভাবে ইংরেজি নাম ব্যবহারে নিরুৎসাহিত করতেই এই উদ্যোগ। কিন্তু অনেকে ইংরেজি নাম দিয়েই সিনেমা মুক্তি দিচ্ছেন।

২০১৭ সালে এসেও বছরের প্রথম সেন্সরে প্রদর্শিত সিনেমাটিও ইংরেজি নাম নিয়ে সেন্সর বোর্ডের ছাড়পত্র পায়। ক্রাইম রোড শিরোনামের সিনেমাটি গত ১৫ জানুয়ারি সেন্সরে প্রদর্শিত হয়। পরে এ নামেই হলে মুক্তি পায়।

কথা হচ্ছে, যৌথ প্রযোজনা নিয়ে কী কোনই নীতিমালা থাকবে না তথ্য মন্ত্রণালয়ের? সেটা আছে বৈকি! বস টু এটা তবে কোন দেশের ভাষা? বাংলাদেশে নির্মিত মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক দু-দুটি চলচ্চিত্রে দাপটের সাথে মুক্তিযোদ্ধার চরিত্রে অভিনয় করে গেলেন যথাক্রমে পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় ও বরুন চন্দ। ভুবন মাঝি আর রিনা ব্রাউন দেখে বুঝে গেছি এই দেশ আর কোন শক্তিমান শিল্পীর সঠিক মূল্যায়ন করবে না। শেষ অব্দি মুক্তিযোদ্ধার চরিত্রটাও যদি অন্য দেশের অভিনেতাদের দিয়ে করাতে হয় তবে আর কী বা বলার থাকে!

বস টু ছবিতে শিল্পী নেওয়ার ক্ষেত্রে মানা হয়নি যৌথ প্রযোজনার নিয়ম। এমন আভিযোগ উঠেছে ছবিটিকে ঘিরে। সম্প্রতি চলচ্চিত্র ঐক্যজোটের পক্ষ থেকে সেন্সর প্রিভিউ কমিটিকে একটি চিঠি দেওয়া হয়। বিএফডিসিতে সেন্সর প্রিভিউ কমিটি ছবিটি দেখেন। সে সূত্রে এ ছবিটির অধিকাংশ শিল্পী কলকাতার বলে জানা গেছে। এ বিষয়ে প্রিভিউ কমিটির সদস্য নাসিরউদ্দিন দিলু বলেন, দুই দেশের শিল্পীদের মধ্যে সমতা কম মনে হয়েছে আমার কাছে। সবাই মিলে মতামত জানিয়ে দিয়েছি আমরা। এরপর সেন্সরবোর্ড বাকি সিদ্ধান্ত নেবেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হলো কী? তথ্য মন্ত্রণালয় থেকে বিশেষ সুবিধা পেল সিনেমাটি।

পরিশেষে, ঈদের দিন মজা করে সময় কাটাবার জন্য উপাদেয় কোন বাংলা সিনেমা না পেলেও রোজার মাসে হল জুড়ে কী ধরনের অশ্লীল সিনেমা চলছে তার খোঁজ ঠিকঠাক পেয়ে গিয়েছি সংবাদমাধ্যমে। এই সিনেমাগুলো কীভাবে হলে গেল আর অবাধে কীভাবে চলছে তা একমাত্র তথ্য মন্ত্রণালয় এবং তাদের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারাই বলতে পারবেন।

রোদেলা নীলা: কবি

বাংলা চলচ্চিত্রের প্রচারণা-পরিবেশনা ও প্রেক্ষাগৃহ সংকট

মাহবুবুল হক ওয়াকিম

বাংলাদেশের প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রতি বছর কোটি কোটি টাকা খরচ করে চলচ্চিত্র নির্মাণ করছে। কিন্তু সেই পরিমাণ আয় করতে পারছে না বলে দাবী করে দুই-একটা প্রতিষ্ঠান ব্যতীত সকলেই। কেন এমনটা হয়? এই প্রশ্নের উত্তর সকলের জানা। গল্পের মান, সব ছবিতে প্রায় একই অভিনয়শিল্পী, নির্দেশনায় ভুল-ত্রুটি, নিম্নমানের ভিএফএক্সসহ আরো অনেক কারণ রয়েছে। তারপরও প্রতি বছর কিছু ভালো চলচ্চিত্র নির্মিত হয়। সমালোচকরা সেই ছবিগুলোর প্রশংসা করেন এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক উৎসবে প্রদর্শিত ও পুরস্কৃত হয়। সেই ছবিগুলোও বাজেটের দৌড় অতিক্রম করতে পারে না। আর এই সফল না হওয়ার পিছনে অন্যতম কারণ চলচ্চিত্রের প্রচারণা ও বিতরণের সংকট।

প্রথাগতভাবে বিভিন্ন দেশের চলচ্চিত্রের প্রচারণা হিসেবে যেসব প্রক্রিয়া দেখতে পাই তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য— প্রেক্ষাগৃহে ও অধুনা ইউটিউবে ছবির ট্রেলার; টেলিভিশন, রেডিও, সংবাদপত্র ও বিলবোর্ডে বিজ্ঞাপন; বিভিন্ন গণমাধ্যমে পরিচালক ও অভিনয়শিল্পীদের প্রচারণামূলক সাক্ষাৎকার। এই বিষয়সমূহের ফলে দর্শকের মাঝে আগ্রহের সঞ্চার হয় এবং তারা ছবি দেখার জন্য টাকা খরচ করে টিকিট কেনেন। নিউইয়র্ক পাবলিক লাইব্রেরির কিউরেটর বারবারা কোহেন-স্ট্র্যাটিনার বলেন, 'দর্শককে চলচ্চিত্র দেখতে আগ্রহী করতে যে বিষয়সমূহে ব্যবহার দেখা যায় তা চলচ্চিত্রের বিকাশের শুরুর সময়েও ব্যবহৃত হতো এবং তা উন্নততর হয়ে এখনো ব্যবহৃত হচ্ছে।' অর্থাৎ এই প্রচারণার কাজগুলো চলচ্চিত্র শিল্প শুরুর সময় থেকেই বিদ্যমান।

আমাদের দেশের চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে প্রচারণার এই সকল কৌশল দেখা গেলেও তার পরিমাণ খুবই সীমিত। দুই একটি প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানকেই এই ধরনের প্রচারণা করতে দেখা যায়। দেশে প্রযোজনা ও পরিবেশনা প্রতিষ্ঠানের হিসাব কষতে গেলে বর্তমানে যে কয়টি প্রতিষ্ঠানের নাম আগে আসে তার মধ্যে রয়েছে— ইমপ্রেস টেলিফিল্ম, জাজ মাল্টিমিডিয়া, মনসুন ফিল্মস, টাইগার মিডিয়া লিমিটেড ও অমি বনি কথাচিত্র। এছাড়া আরো নামে-বেনামে বহু প্রতিষ্ঠান রয়েছে যেগুলো দুই-একটা চলচ্চিত্র প্রযোজনা করে ঠিকমত প্রচারণা ও পরিবেশনা করতে না পেরে এবং মূলধন তুলতে না পেরে হারিয়ে যাচ্ছে। অথচ একসময় এই ইন্ড্রাস্টিতে দাপটের সাথে চলচ্চিত্র প্রযোজনা ও পরিবেশনা করেছে আলমগীর পিকচার্স, এস এস প্রডাকশন্স, পারভেজ ফিল্মস, চাষী চলচ্চিত্র, কাজী হায়াৎ ফিল্মস, সন্ধানী কথাচিত্র-সহ আরো কিছু প্রতিষ্ঠান। এখন আসি বর্তমানে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য দুটি প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানের প্রচারণার পরিবেশনা প্রসঙ্গে, তাহলে বোঝা যাবে এই লেখায় প্রচারণা ও পরিবেশনাকে কেন গুরুত্ব দিচ্ছি।

জাজ মাল্টিমিডিয়া ডিজিটাল চলচ্চিত্র নির্মাণ ও বিতরণের স্লোগান নিয়ে ২০১২ সালে ভালোবাসার রঙ দিয়ে যাত্রা শুরু করে। ছবির প্রচারণার জন্য বেছে নেয় সোশ্যাল মিডিয়াকে। ইউটিউব, ফেসবুক, টুইটারে তাদের সরব উপস্থিতি রয়েছে, এমনকি একটি অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপও তৈরি করেছে। জাজের সোশ্যাল মিডিয়ার আপডেট নিয়ে প্রতিনিয়ত তোলপাড় হয় সোশ্যাল মিডিয়া কমিউনিটিতে। ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠানটি নির্মাণ করেছে ৩০টি চলচ্চিত্র।

এর মধ্যে দুই-একটা ব্যতীত বাকি সবগুলোই বিভিন্ন চলচ্চিত্রের অফিসিয়াল-আনঅফিসিয়াল পুনঃনির্মাণ। তারপরও ছবিগুলো ব্যবসাসফল হয়েছে প্রচারণা-সুষ্ঠু বিতরণের কারণে। এ তালিকায় রয়েছে ভালোবাসা আজকাল (২০১৩), পোড়ামন (২০১৩), অগ্নি (২০১৪), রোমিও বনাম জুলিয়েট (২০১৫), অগ্নি ২ (২০১৫), বাদশা দ্য ডন' (২০১৬), শিকারি (২০১৬) ও রক্ত (২০১৬)।

তবে যৌথ প্রযোজনার নামে জাজ বাংলাদেশ থেকে নামমাত্র কলাকুশলী নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণ করছে এমন অভিযোগ উঠছে প্রায়ই। পরিচালনার পাশাপাশি ছবির কেন্দ্রীয় নারী ও পুরুষ দুই চরিত্রেই ভারতীয় শিল্পীদের নিয়ে কাজ করছে। আবার বাংলাদেশি কেন্দ্রীয় অভিনয়শিল্পী দুই-একজন থাকলে বাকি বেশির ভাগ কলাকুশলী ভারতীয় এমনটা প্রায়ই দেখা যাচ্ছে। শিকারি-তে দেখা যায় কেন্দ্রীয় চরিত্রে শাকিব খান এবং একটি পার্শ্ব চরিত্রে অমিত হাসান ছাড়া বাকি সকল প্রধান অভিনয়শিল্পী, এমনকি কলাকুশলীরাও ভারতীয়। বাদশা দ্য ডন-এ দেখা যায় নুসরাত ফারিয়া ছাড়া বাকি অভিনয়শিল্পী, পরিচালক ও কলাকুশলীরা ভারতীয়। এতে প্রচারণায় তারা কিছু সুবিধাও পাচ্ছে। দর্শক যারা একই শিল্পীর মুখ দেখে হাঁপিয়ে যাচ্ছে তারা একসাথে দুই বাংলার শিল্পীদের কাজ দেখতে পারছে।

অন্যদিকে, আরেক প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান ইমপ্রেস টেলিফিল্ম ১৯৯০ এর দশকের শেষ হতে চলচ্চিত্র প্রযোজনা করে আসছে। এ প্রতিষ্ঠানের নির্মিত চলচ্চিত্রের সংখ্যা প্রায় ৯০ ও ৩৬টি চলচ্চিত্রের স্বত্ব কিনেছে। ইমপ্রেসের চলচ্চিত্রের বৈশিষ্ট হল প্রথাগত অ্যাকশন বা সামাজিক অ্যাকশন গল্পের বাইরে গিয়ে নাট্যধর্মী চলচ্চিত্র নির্মাণে বিনিয়োগ করে থাকে এবং তা সমালোচকদের প্রশংসা লাভ করে ও বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় পুরস্কৃত হয়।

এ প্রতিষ্ঠানের প্রযোজিত ও পরিবেশিত এরকম পুরস্কারপ্রাপ্ত চলচ্চিত্রের মধ্যে রয়েছে কিত্তনখোলা (২০০০), জয়যাত্রা (২০০৪), দারুচিনি দ্বীপ (২০০৭), গহীনে শব্দ (২০১০), গেরিলা (২০১১), উত্তরের সুর (২০১২), মৃত্তিকা মায়া (২০১৩)। সবগুলো চলচ্চিত্র শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রসহ বিভিন্ন বিভাগে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার লাভ করলেও এর মধ্যে গেরিলা, ব্যাচেলর ও জালালের গল্প ছাড়া বাকি চলচ্চিত্রগুলো প্রেক্ষাগৃহে সপ্তাহখানেকের বেশি দেখা যায়নি।

মূলত টেলিভিশন চলচ্চিত্র (টেলিফিল্ম) নির্মাণের লক্ষ্যে এই প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করলেও পরে চলচ্চিত্র নির্মাণে আগ্রহী হয়। কিন্তু টেলিফিল্মের বাজেটে চলচ্চিত্র নির্মাণের কারণে প্রচারণায় তেমন গুরুত্ব দেয় না। এবং প্রদর্শনের জন্য প্রেক্ষাগৃহের চেয়ে বেশি বেছে নেয় নিজস্ব টেলিভিশন চ্যানেল চ্যানেল আই-কে। ফলে যেসব দর্শক প্রেক্ষাগৃহে ভালো চলচ্চিত্র দেখার জন্য মুখিয়ে থাকেন তারা টেলিভিশন সেটে দেখে নেয় সেসব চলচ্চিত্র। আবার কখনো কখনো অতিরিক্ত বিজ্ঞাপনে অতিষ্ঠ হয়ে দেখেই না। ফলে সেই চলচ্চিত্রগুলো অদেখাই থেকে যায়। তথ্য মন্ত্রণালয় থেকে চলচ্চিত্র প্রেক্ষাগৃহের বাইরে প্রদর্শনে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, তবে কেন এই চলচ্চিত্রগুলো প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি না দিয়ে টেলিভিশনে প্রিমিয়ার হয়!

এই ঈদুল ফিতরের দিনেও (২০১৭ সালে) দেখা যাবে আবু সাইয়ীদ পরিচালিত ড্রেসিং টেবিল। ঈদের দিন ব্যস্ততার ফাঁকে ও বিজ্ঞাপনের ফাঁকে ধৈর্য্য ধরে কতজন দর্শক ছবিটি দেখবে এটা নিয়ে তারা কি কখনো ভেবেছেন? হয়তো না। ঈদে ব্যস্ত মানুষজন কিছু সময় পায় তা তারা আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধবদের দিতে চায়, হৈ-হুল্লোড় করে, একসাথে সিনেমায় যায়। ঘরে বসে সিনেমা দেখা মানুষের সংখ্যা খুবই কম। টেলিভিশনে প্রিমিয়ার হোক তাতে সমস্যা নেই, কিন্তু তার আগে প্রেক্ষাগৃহে প্রদর্শন করা হোক এটাই দর্শকদের দাবী।

এরই মধ্যে আবার সম্প্রতি (দেশের) প্রথাগত বাণিজ্যিক ধারা থেকে ভিন্ন চলচ্চিত্র আয়নাবাজি প্রচারণা ও বিতরণের জোরে টিকে যায় এবং তুলনামূলক ভালো ব্যবসা করে ২০১৬ সালে সর্বোচ্চ আয়কারী চলচ্চিত্রের তালিকায় তিনে অবস্থান করে। এই সাফল্যের পেছনে রয়েছে পরিচালক অমিতাভ রেজা চৌধুরীর নির্দেশনা, ভালো গল্প ও অভিনয়, চিত্রগ্রহণ। এই বিষয়গুলোই চলচ্চিত্রটিকে ব্যবসাসফল করতে যথেষ্ট ছিল। তবু অমিতাভ ও তার ছবির প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান কন্টেন্ট ম্যাটার্স ও হাফ স্টপ ডাউন নির্মাণ বাজেটের প্রায় সমপরিমাণ অর্থ প্রচারণায় খরচ করেছে। ফলে প্রথম সপ্তাহে ঢাকায় ৫টি-সহ সারাদেশে মোট ২০টি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেলে প্রচারণা ও দর্শকদের আগ্রহে পরের সপ্তাহগুলোতে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এমনটি আগে ঘটেছিল ২০০৯ সালে মনপুরা চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে। উক্ত ছবিটিও মাত্র চারটি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়ার পর দর্শকদের আগ্রহে সারাদেশে ৫০টি প্রেক্ষাগৃহে টানা সাত সপ্তাহ প্রদর্শিত হয়।

যদিও মনপুরা-র ক্ষেত্রে ছবির প্রচারণার চেয়ে গল্পই মুখ্য ছিল, আয়নাবাজি-তে দুটির সংমিশ্রণ ছিল। তাছাড়া আয়নাবাজি-র প্রচারণা লক্ষ্য করা যায় তাদের টেলিভিশন সিরিজেও। ২০১৭ আইসিসি চ্যাম্পিয়নস ট্রফির মাঠেও তাদের প্রচারণামূলক বিজ্ঞাপন দেখা যায়।

একই বছর মুক্তি পায় তৌকীর আহমেদ পরিচালিত চলচ্চিত্র অজ্ঞাতনামা। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে পুরস্কৃত ছবিটি নিজের দেশে হাতেগোনা কয়েকটি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায় এবং সপ্তাহ দুয়েক চলার পরই প্রেক্ষাগৃহ থেকে নেমে যায়। পরে ইউটিউবে ছবিটি আনঅফিশিয়ালি প্রকাশ হলে দর্শক হুমড়ি খেয়ে পড়ে। বাহবা দেয় তৌকীরের পরিচালনা, চিত্রনাট্য ও ফজলুর রহমান বাবুর অভিনয়ের এবং প্রেক্ষাগৃহে গিয়ে দেখতে না পারায় আফসোস করে। এখানেও ব্যর্থতার দায়ভার বর্তায় ইমপ্রেস টেলিফিল্মের উপর। ছবিটির প্রযোজনা ও পরিবেশনা প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠানটি সর্বোচ্চটুকু দেয়নি বা তারা দর্শকদের কথা না ভেবে শুধু মূলধন তুলেও কাজ সমাধা করে ফেলে। আবার বলছি তাদের নির্মাণ বাজেট কম এবং এ কারণে সারাদেশে চলচ্চিত্র প্রদর্শনের খরচ না করে কয়েকটি হলেই ছবি মুক্তি দিয়ে মূলধন তুলে প্রেক্ষাগৃহ থেকে ছবি নামিয়ে দেয়। আর বিভিন্ন উৎসবের পুরস্কার তো আছেই। তাতেই হয়ে যায়। এ থেকে দেখা যায় শুধু ভালো গল্প হলেই হবে না, তা দর্শকদের কাছে পৌঁছাতেও হবে।

ভালো গল্পের ছবি নির্মিত হলেও ছবি বিতরণের জন্য পিছিয়ে যায়। প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান ও হল মালিকদের মাঝে রয়েছে বুকিং এজেন্ট নামে মধ্যস্থতাকারী। মূলত তারাই নির্ধারণ করে কোন ছবি চলবে, কোন ছবি চলবে না। আর তাদের পছন্দ থাকে অ্যাকশন-রোমান্টিক ধরনের গল্পে। ফলে ভিন্নধারার ভালো গল্পের চলচ্চিত্রগুলো তেমন একটা হল পায় না এবং মুনাফা অর্জন করতে পারে না।

ঢাকার বাইরের হল মালিকরা পুরোপুরি বুকিং এজেন্টদের উপর নির্ভরশীল, ঠিক তেমনি ছবির প্রযোজকরাও। এই সুযোগে তারা তাদের খুশিমত চার্জ নেয় প্রযোজকদের কাছ থেকে। প্রযোজক ও হল মালিকদের মধ্যে টেবিল কালেকশনের একটা অংশ (৫-১০%) হাতিয়ে নেয় এই এজেন্টরা। পাশাপাশি ছবি পাইয়ে দেওয়ার জন্য হল মালিকদের থেকেও নেট আয়ের একটা অংশ নিয়ে থাকে। এতে করে হল মালিকরাও প্রযোজকদের প্রকৃত আয়ের চেয়ে কম দেখান ও পাওনা পরিশোধ নিয়ে হেলাফেলা করেন। হয়ত এসব ঝামেলায় না জড়ানোর জন্য ইমপ্রেস তাদের ছবি টেলিভিশনে প্রিমিয়ার করে থাকে।

বিতরণের এহেন সমস্যার পর চলচ্চিত্র প্রযোজকদের মুনাফা না ওঠার আরেকটি কারণ হল প্রেক্ষাগৃহ সংকট ও এতে পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধার অভাব। ২০০০ সালে দেশে প্রেক্ষাগৃহের সংখ্যা ছিল প্রায় ১০০০ এবং ২০১০ এর শেষে এসে তা দাড়ায় ৭০০।

বর্তমানে সক্রিয় রয়েছে ৩০০টির মতো, বা আরো নির্দিষ্ট করে বললে ৩১৭টি (সূত্র : বাংলা ট্রিবিউন)। এই কমার প্রথম কারণটা সকলে জানা, অশ্লীলতা। যার কারণে দর্শক হলে যাওয়া বন্ধ করে দেয় এবং হলগুলোও বন্ধ হতে থাকে। আর দ্বিতীয় কমার কারণ বিতরণ ব্যবস্থায় উপরিউল্লেখিত বিষয়সমূহ। যার ফলে ছবি না পেয়ে দিনের পর দিন লোকসান দেয় হল মালিকরা আর বন্ধ হয়ে যায় হলগুলো।

যাই হোক, ৩০০ হলের মধ্যে সারা বছর চলে ২০০-২৫০টি এবং ঈদে চলে সবগুলো। এর মধ্যে সিনেপ্লেক্স আর ঢাকার কিছু হলসহ ৭০-৮০টি হল ছাড়া বাকিগুলোর অবস্থা বেহাল। প্রজেকশন, সাউন্ড সিস্টেম, পরিবেশ নিয়ে অভিযোগ দর্শকদের। এখানেও প্রসঙ্গত আসে জাজ মাল্টিমিডিয়ার নাম। প্রতিষ্ঠানটি চলচ্চিত্র ইন্ড্রাস্টিতে আসার পর প্রায় ১০০ এর উপর হলে প্রজেকটর ও সাউন্ড সিস্টেম বসিয়েছে। ফলে সেসব হলের দর্শকরা তুলনামূলক আগের চেয়ে ভালোভাবে ছবি দেখছে, তাদের নিজস্ব সার্ভারে ছবি প্রদর্শনের জন্য কমেছে পাইরেসি। কিন্তু আবার প্রজেকটর ও সাউন্ড সিস্টেম ব্যবহারের জন্য এই হলগুলো জিম্মি হয়ে গেছে জাজের কাছে এবং বড় উপলক্ষগুলোতে, যেমন; ঈদ, পহেলা বৈশাখ, ভালোবাসা দিবসে তাদের বাইরে অন্য ছবি চলতে দেয় না।

একজন ভালো নির্মাতা ভালো ছবি নির্মাণ করলেই তার দায়িত্ব শেষ হয় না। তা দর্শককে জানাতে হবে, তাদের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। অর্থাৎ তাকে একজন মার্কেটারও হতে হবে। আর দর্শকের কাছে চলচ্চিত্র পৌঁছে দিতে এর বিতরণ ব্যবস্থাও উন্নত করতে হবে। বিতরণ আরো স্বচ্ছ করতে বুকিং এজেন্ট প্রথা বাতিল, ই-টিকিটিং প্রথা চালু ও নির্দিষ্ট সার্ভার থেকে ছবি প্রদর্শন আবশ্যক। পাশাপাশি দরকার হলের সংস্কার। ডিজিটাল প্রজেকশন ও সাউন্ড সিস্টেমসহ মাল্টিপ্লেক্স নির্মাণে কর মওকুফ (কমপক্ষে পাঁচ বছরের জন্য); বিদ্যমান হলের প্রজেকশন, সাউন্ড সিস্টেম সংযোগ ও এগুলো সংস্থাপনে কর ছাড় এবং সিট, এসিসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা জরুরি হয়ে গেছে। বাংলা চলচ্চিত্রের সুদিন ফিরে পেতে এই কাজগুলো অতিদ্রুত করতে হবে।

মাহবুবুল হক ওয়াকিম : লেখক ও গবেষক

কলকাতার ইন্ডাস্ট্রি বাঁচাতে সাফটা ও যৌথ প্রযোজনা

মুমতাহিন হাবিব

অনুপম রায়ের বাক্যবাগীশ অ্যালবামের টাইটেল ট্র্যাকে বাঙালির চরিত্র সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'নিজের ঘরের ইট নড়ে উঠলেই জানি কামড়ায়।' তাই যতক্ষণ পর্যন্ত মাথাব্যাথার কারণ হয়নি ততক্ষণ পর্যন্ত এই লেখার প্রয়োজনও বোধ আমরা করিনি। কিন্তু এখন সাফটা, যৌথ প্রযোজনা এসব আমাদের বিষফোঁড়ার কারণ।

সাফটা চুক্তি : বাংলাদেশে প্রতি বছর বাজেট ঘোষণা হলে সেটা একমাত্র বড় বড় আলোচকদের গোলটেবিল আলোচনার টেবিল ছাড়া আর কোথাও আলোচনা হতে দেখা যায় না যদি বা কলরেট অথবা সিগারেটের দাম না বাড়ে (যদিও এবার ব্যাংক অ্যাকাউন্টের আবগারি শুল্ক নিয়ে হচ্ছে)। ঠিক তেমনভাবে সাফটা নিয়ে আমারও সাধারণ জ্ঞানের দৌড় হল— 'দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক মুক্তবাণিজ্য চুক্তি। সার্ক চুক্তিভুক্ত দেশসমুহের মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিকেই সংক্ষেপে ও ইংরেজিতে সাফটা (SAFTA) বলা হয়। ২০০৪ সালের জানুয়ারি মাসে ইসলামাবাদে এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।' এর বাইরে আর এটাই জানতাম যে, এই চুক্তির কারণে সার্কের এক সদস্য দেশের পণ্য অন্যদেশে ট্যাক্সে ছাড় পায়।

আগে পত্রিকায় নিউজ দেখতাম, ভারতীয় অনেক ছবি এয়ারপোর্ট আর সেন্সরেই আটকে আছে। তারপর একদিন হঠাৎ দেখা শুরু করলাম ভারতীয় নতুন ছবির পোস্টার আর ঘটনা জানতে পারলাম— সাফটাতে চলচ্চিত্র বিনিময় নিয়েও চুক্তির একটা ধারা আছে। যাতে বলা আছে, সার্কভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে চলচ্চিত্র বিনিময় করা যাবে। সংস্কৃতি বিনিময়ের এই চুক্তি আসলে কতটা সংস্কৃতি বিনিময় আর কতটাই বা মুক্ত বাজার অর্থনীতির নামে আগ্রাসন সেই প্রশ্ন থেকেই যায়।

সার্কভুক্ত দেশসমুহের মধ্যে বিনিময়ের কথা থাকলেও সেটা আদতে হচ্ছে কেবলমাত্র ভারতের সাথে, বিশেষভাবে বললে ভারতের একটি রাজ্যের সাথে। চলুন দেখি আসলে এই বিনিময়ে কার কী লাভ হচ্ছে।

চলচ্চিত্রে বিভাজনকে অস্বীকার করতে চাইলেও সত্যি বলতে ফিল্ম দুই ধরনের হয়, একটা হলে সিটি মেরে লোকে দেখে যাকে ইন্ডাস্ট্রির অক্সিজেন বলা হয়, এই ধারাকেই কমার্শিয়াল বলা হয়। আরেকটা হল প্যারালাল বা আর্ট, এটা আসলে কিছুটা সিনেমাখোর মানুষদের জন্য, ইন্টেলেকচুয়ালিটির কারণে যেমন সমালোচক মহলে প্রশংসিত হয় তেমনি অনেক পুরস্কারও বগলদাবা করে, তাই একে বলা হয় ইন্ডাস্ট্রির প্রেস্টিজ। দ্বিতীয় ধারার ফিল্মকে ওয়ার্ল্ড ফিল্মের মেম্বার বলা হয়, সেক্ষেত্রে বিনিময়ের সময় সাধারণত এই টাইপ ফিল্মই প্রাধান্য পায়।

কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের সাথে আমাদের বিনিময়ের সময় যা বিনিময় হচ্ছে তার সবকটাই বাণিজ্যিক, অজুহাতও হাজির— ইন্ডাস্ট্রি বাঁচাও। যেহেতু দুই ইন্ডাস্ট্রিতেই খরা চলছে তাই তর্কের খাতিরে মেনে নিলাম যে, একই ভাষাভাষী দুটো ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে একের অপরের জন্যে দরদ উথলে পড়ছে। চলুন দেখে আসি গত বছরে কী হয়েছে— হুমায়ুন আহমেদের উপন্যাসে নির্মিত কৃষ্ণপক্ষ-এর ডিস্ট্রিবিউশনের দায়িত্ব নেওয়া জাজ মাল্টিমিডিয়াই কলকাতা থেকে অজ্ঞাত এক বেপরোয়া-কে এনে হাজির করে আর কৃষ্ণপক্ষ-কে করে কোণঠাসা। বোর হবেন না, আরো সার্কাস আছে, যারা এই বেপোরোয়া নিয়ে দেশিয় ছবির সাথে বেপরোয়া আচরণ করল তারাই আবার শ্রী ভেঙ্কটেশ ফিল্মসের (এসভিএফ) কেলোর কীর্তির সময় 'হল দেবো না'- টাইপ কথা বলে কুমিরের কান্না জুড়ে দিল। হিপোক্রিসি ওভারলোডেড। যাই হোক, প্রাপ্ত তথ্য মতে এটাই এখন অবধি বাংলাদেশে ভালো ব্যবসা করা আমদানির একমাত্র ছবি, কিন্তু এর বিনিময়ে কলকাতা যায় রাজা ৪২০, যার মুক্তি নিয়ে কিছু জানা যায় না। এই সময়ের মধ্যে বেলাশেষে আর ছুঁয়ে দিলে মন-এর বিনিময় হয় এবং এটাই বোধহয় সমবিনিময়ের প্রথম এবং এখন অবধি একমাত্র উদাহরণ যা কলকাতায় লম্বা সময় ধরে চলে। এরপর সম্রাট-এর বিনিময়ে আসে কলকাতার 'ডিজিস্টারাস ফ্লপ' ছবি অভিমান। বরাবরের মতো এবারো সম্রাট-এর কপালে রুপশ্রী, কালিগঞ্জ টকিজ ও মোহন নামে ৩টি হল জোটে। এই বছরই রাজাবাবু-র বিনিময়ে তোমাকে চাই এবং নগর মাস্তান-এর বিনিময়ে হরিপদ ব্যান্ডওয়ালা মুক্তি পায়। আর ওয়ান-এর জন্যে কোন ছবিই বিনিময় করা লাগেনি, সেন্সরে জমা দিয়ে পরদিনই ছাড়পত্র পায়। আর এই ছবিগুলো এতটাই আগ্রাসী রূপ ধারণ করে যে তা বেছে বেছে সত্তা, সুলতানা বিবিয়ানা, পরবাসিনী নামক নতুন তিন নির্মাতার তিনটি স্বপ্নকে গিলে খায়। আরো আক্ষেপের ব্যাপার, এই সাফটা নির্ভর প্রতারণায় যখন তিতাস একটি নদীর নাম, পদ্মা নদীর মাঝি, মনের মানুষ, শঙ্খচিল-এর প্রযোজক হাবিবুর রহমান খানও জড়ান।

এতক্ষণে আশা করি বুঝতে পারছেন এই বিনিময়ে আমরা আসলেই কিছু পাচ্ছি না। তাহলে লাভটা কার হচ্ছে? তাহলে চলুন একটু পেছনে যাই। সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক, মৃনাল সেনদের হাতে গড়া সমৃদ্ধ পশ্চিমবঙ্গ ১৯৯০ এর দিকে স্বপন সাহাদের হাত ধরে মান হারাতে থাকে। তখন এতটাই সংকটে পড়ে যায় যে, বাংলাদেশি ছবিও তারা অহরহ রিমেক করেছে। তারপর ২০০০ সালের দিকে তারা গল্পের খনির খোঁজ পায় দক্ষিণ ভারতে, দেদারসে শুরু করে তামিল, তেলেগু ছবির রিমেক। ইন্ডাস্ট্রির অক্সিজেন সোর্সই হয়ে যায় দক্ষিণ ভারত। এর মাঝে বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, ঋতুপর্ণ ঘোষ, অপর্ণা সেন, গৌতম ঘোষদের চেষ্টা থাকলেও কলকাতা ইন্ডাস্ট্রির নিয়ন্ত্রণ রিমেক মেকারদের হাতেই থাকে। ২০০৯-১০ এর দিকে আসে সৃজিত মুখার্জি, কৌশিক গাঙ্গুলি, কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায়, অনিরুদ্ধ রায় চৌধুরী, শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, অরিন্দম শীলরা। আস্তে আস্তে তারা শক্ত অবস্থান তৈরি করতে থাকে আর ২০১৩ সালে চাঁদের পাহাড়-এর পর ইন্ডাস্ট্রির পুরো নিয়ন্ত্রণ চলে যায় মৌলিক গল্পের নির্মাতাদের হাতে। যেখানে এতকাল ধরে রিমেকনির্ভর মাথামোটা একটা দল তৈরি হয়েছে তাদের এবার না খেয়ে মরার অবস্থা হলো। তাই এবার তাদের সহজ টার্গেট 'বাংলাদেশ'।

এ কথার সত্যতা খুঁজতে চান? তাহলে চোখ রাখুন কলকাতার সবচেয়ে প্রভাবশালী অভিনেতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের কিছু ইন্টারভিউতে। বক্তব্যগুলো এমন ছিল—
- আমাদের ইন্ডাস্ট্রির এই দুর্দিনে নতুন বাজার তৈরি করতে হবে।
- এবার আমাদের বাংলাদেশের মার্কেটের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে, নতুবা বাঁচবে না আমাদের কমার্শিয়াল ফিল্ম। আর কমার্শিয়াল ফিল্ম না বাঁচলে ইন্ডাস্ট্রিও বাঁচবে না।
- দেশ বিদেশে থাকা সকল বাংলা ভাষাভাষী দর্শকের কাছে আমাদের ছবি পৌঁছে দিতে হবে। আর হ্যাঁ, অবশ্যই বাংলাদেশি দর্শকদের কাছে আমাদের ছবি পৌঁছতে হবে। নতুবা বাজেটও তুলে আনা সম্ভব না।
- আমাদের ইন্ডাস্ট্রির পরিধি বাড়াতে হবে, বাংলাদেশকেও এর অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
শেষ লাইনটা একবার খেয়াল করুন। সিরিয়াসলি? একটা স্বাধীন দেশের ইন্ডাস্ট্রি পাশের দেশের একটা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হবে!

দিনের পর দিন প্রসেনজিৎ, দেব, শ্রীকান্ত মোহতাদের পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির সফরসঙ্গী হওয়া কিংবা দফায় দফায় বৈঠক আসলে এই পরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়নেরই চেষ্টা। (তাও তো ভাবতে ভালো লাগে তাদের অভিভাবক আছে, আর আমাদের লেজেন্ডরা ফিল্ম থেকে টাকা কামিয়ে মার্কেট বানান, গার্মেন্টস দেন কিন্তু ফিল্মে কখনো ইনভেস্ট করে না। কালেভদ্রে করলেও সেটা আসলে সুপুত্রদের নায়ক বানানোর চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই না। কখনো ইন্ডাস্ট্রির কথা ভাবা তো দূরে থাক, খবরও নিতে দেখা যায় না। খালি বিশেষ দিবসে নতুন নির্মাতাদের ব্যর্থতা মিডিয়ায় তুলে ধরা আর ফ্যামিলি মেম্বারদের জন্যে এফডিসির উপর রাগ ঝাড়া ছাড়া আসলেই কিছু করেন না।)

যাই হোক, কলকাতার এখনকার ছবির প্রি-প্রোডাকশন টাইমে বাজেট থেকে প্ল্যানিং সবই করছে বাংলাদেশকে মাথায় রেখে। তাদের রিমেক কমার্শিয়ালকে বাঁচিয়ে রাখতে চাইছে শুধুমাত্র বাংলাদেশের মার্কেটের উপর নির্ভর করে। এমনকি তাদের মৌলিক ছবিগুলোর বাজেটও বাড়াচ্ছে বাংলাদেশকে মাথায় রেখে। চাঁদের পাহাড়-এর সিক্যুয়াল আমাজান অভিযান-এর বাজেট ২০ কোটি করা হয়েছে বাংলাদেশের মার্কেটকে মাথায় রেখে। ছবিটি পুজোয় আসার কথা থাকলেও পিছিয়ে ক্রিসমাসে নেওয়া হয়েছে, কেন জানেন? শুনুন তাহলে—

১. এবার ক্রিসমাসে বলিউডের আমির খানের কোন ছবি নেই। তাই বড় ক্ল্যাশ ফেস করতে হবে না, তাছাড়া পুজোর চড়া বাজারে সৃজিতের একটা ক্রেজ আছে, তাই ইয়েতি অভিযান-কে (এটা আবার যৌথ প্রযোজনা!) ছেড়ে দেওয়া হোক।
২. বাংলাদেশে পুজা বৃহৎ উৎসব নয়। বরং ডিসেম্বরে রিলিজ করলে শীতের ছুটি ও বছর শেষের ছুটিতে থাকা স্টুডেন্টদেরও ধরা যাবে।

যৌথ প্রযোজনা : ২০১৫ থেকে এখন অবধি যৌথ প্রযোজনা নিয়ে প্রচুর চর্চা হয়ে গেছে, তাই একে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার বোধহয় কিছু নেই। দুইদেশ মিলে ছবি বানাবে আর তার জন্য বাংলাদেশ সরকার ১৯৮৬-তে আইন করেছে যা আবার ২০১২-তে সংশোধন করা হয়েছে এবং যৌথ প্রযোজনায় চলচ্চিত্র নির্মাতারাও সগর্বে বুড়ো আঙুল দেখাচ্ছেন এইসব নীতিমালার প্রতি। আসলে সাফটা দিয়ে কলকাতার ইন্ডাস্ট্রি বাঁচানোর চেষ্টা কিংবা প্রসেনজিতদের 'সম্প্রসারিত ইন্ডাস্ট্রি' আইডিয়ার আরেক রূপ এই যৌথ প্রযোজনা। কলকাতার মুভির প্রতিটি গ্রামার মানার পাশাপাশি একটি বা দুইটি চরিত্রে বাংলাদেশিদের জায়গা দিলেই তৈরি হয়ে যাচ্ছে আদর্শ যৌথ প্রযোজনার ছবি।

আগেও অনেক যৌথ প্রযোজনা হয়েছে,কিন্তু আধুনিক যৌথ প্রযোজনার জনক হলেন এসকে মুভিজের 'আশোক ধানুকা'। ভারতে মারোয়াড়িদের ব্যবসায়ী ক্ষমতার ব্যাপক সুনাম। বলা হয়ে থাকে, মারোয়াড়িরা যে কোনো ব্যবসায় হাত দিয়েই রাজত্ব করতে পারে। বলে রাখা ভালো কলকাতা ইন্ডাস্ট্রির মোহতা-সনি, ধানুকা কিংবা হিরো জিৎ— সবাই মাড়োয়াড়ি। এমনিতেই ধানুকা সাহেবের এই মার্কেটের উপর চোখ অনেক আগে থেকেই। কিন্তু যখন আরেক মারোয়াড়ি প্রতিষ্ঠান এসভিএফের কাছে সর্বস্ব হারাচ্ছেন তখনি অনন্য মামুনকে নিয়ে মাঠে নেমে গেলেন এই ইন্ডাস্ট্রি দখলের জন্য। নির্মিত হলো আমি শুধু চেয়েছি তোমায়। এরপর সাথী হিসেবে পেলেন জাজ মাল্টিমিডিয়াকে যারা কলকাতায় কোণঠাসা এই প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানকে পুনর্বাসন এবং ভারতের হাতে এই ইন্ডাস্ট্রিকে তুলে দিতে যেন একরকম প্রতিজ্ঞাই করে ফেলল। তারপর একে একে আসছে প্রায় কলকাতার সবকয়টা প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান। তার মাঝখানে জাতি দেখে ফেলল আরো বড় কিছু সার্কাস—

- শিল্পী সমিতির নির্বাচনের আগে কাফনের কাপড় পড়ে নেমে গেলেন জনৈক সুপারস্টার। সভাপতিও হলেন। এখন তো সভাপতি হিসেবে যৌথ প্রযোজনায় দেশিয় শিল্পী ঢুকানো উনার দায়িত্ব। তাই নিজেই নেমে গেলেন। তারপর জাতি দেখল কিভাবে রাতারাতি যৌথ প্রতারণা শুদ্ধ হয়ে গেল। এরপর শুরু হল সেই সুপারস্টারের দেশিয় ছবিকে ঝুলিয়ে ওপার বাংলার ছবিকে শিডিউল দেওয়ার মহোৎসব। নিজেই দায়িত্ব নিয়ে নিলেন কলকাতার সবকটা প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানকে বাংলাদেশে নিয়ে আসার। সর্বশেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত তিনি এসভিএফের বাংলাদেশি কো-অর্ডিনেটরের কাজ করে যাচ্ছেন।

- মাঝখানে নদীর অনেক জল গড়াল এবং আরেকটি নির্বাচন আসল। নতুন সভাপতি প্রার্থীও আগের জনের মতো যৌথ প্রযোজনার বিরুদ্ধে গলা ফাটালেন। তারপর গ্রামার অনুযায়ী তিনিও নির্বাচিত হলেন এবং নতুন যৌথ প্রযোজনায় চুক্তিবদ্ধ হলেন। অতঃপর তার মুখ থেকে নিঃসৃত হল অমর কবিতাখনি, 'আমি আর শাকিব মানেইতো ৭০%'।

আসলে সবাই নিজেদের আখের গুছিয়ে নেওয়ায় ব্যস্ত। এভাবে হয়তো কিছু মানুষ লাভবান হচ্ছে কিন্তু ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশের ইন্ডাস্ট্রি। এই ইন্ডাস্ট্রিকে ব্যবহার করে কলকাতা বাঁচিয়ে রাখছে তাদের 'রিমেক নির্ভর কমার্শিয়াল' ফিল্মকে। আবার জাগিয়ে তুলছে তাদের মৃতপ্রায় প্রোডাকশন হাউজগুলোকে। পুনর্বাসিত করছে তাদের 'পড়তি সাবেক সুপারস্টার' জিৎ কিংবা 'ফ্লপ হিরো' ওম, অঙ্কুশ, ইয়াশদের। আগাছার মতো সবটা শুষে খাচ্ছে আর আমাদের স্বপ্নগুলোর কেবল খোলস পড়ে থাকছে। নতুন করে আন্দোলন হওয়ায় বস টু বা নবাব আটকে যাওয়াটা হয়তো সুবাতাস মনে হচ্ছিল। কিন্তু নতুন খবর হলো, 'নাকে খত দিয়ে ওই ছবিগুলোর প্রযোজক ভবিষ্যতের ওয়াদা করে ছাড়পত্র পেয়ে যাচ্ছেন।' আসলে তাদের লবিং এতটাই শক্তিশালী যে কোনোকিছুই তাদের আটকাতে পারবে না এবং তাই ভবিষ্যতেও ঠিক হওয়ার কোন সম্ভবনা নেই।

তাদের অজুহাত তারা হল বাঁচাবে। এতটাই তারা হল বাঁচিয়েছে যে, জাজ মাল্টিমিডিয়া যে হলে তাদের ব্র্যান্ডের গুনগান গেয়ে শর্টফিল্মের শুট করেছে সেই হলটিই বন্ধ হয়ে গেছে। তারপরও যদি কয়েকটি হল বেঁচে যায় সেগুলো হবে কলকাতা ইন্ডাস্ট্রির বর্ধিত অংশ। নিজের গা ঝাড়তে ঝাড়তে এভাবেই নিঃস্ব হবে ঢাকার ইন্ডাস্ট্রি।

দুঃখিত, কোনো আশার বাণী শোনা যাচ্ছে না। সরকারের উচ্চপর্যায় থেকে যখন সমর্থন নিয়ে এই নৈরাজ্য চলতে থাকে তখন বাংলা চলচ্চিত্র ধ্বংসের নীরব সাক্ষী হওয়া ছাড়া আমাদের আর কিছু করার নেই।

মুমতাহিন হাবিব : চলচ্চিত্র বিষয়ক লেখক

অশ্লীল যুগ : এড়িয়ে যাওয়া যাবে, অস্বীকার করা যাবে না

জুবায়েদ দ্বীপ

এক.
চলচ্চিত্র নির্মাণ শুরু হয় ১৮৯০ এর দিকে। ওই সময়ে আমাদের ভূখণ্ডে চলচ্চিত্র নির্মিত না হলেও বেশ কয়েকটা প্রদর্শনী হয়েছিল। এই অঞ্চলে ১৯০০-এর দশকে নির্বাক এবং ১৯৫০-এর দশকে সবাক চলচ্চিত্র নির্মাণ ও প্রদর্শন শুরু হয়।

৪০ ও ৫০ এর দশকে তৎকালীন ব্রিটিশ ইন্ডিয়া ও পূর্ব পাকিস্তানে নামে-ছদ্মনামে অনেকে চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছেন তবে সেগুলো ঐতিহাসিকভাবে আলোচ্য নয়। বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাস শুরু ১৯৫৬ সালে, মুখ ও মুখোশ ছবিটির মাধ্যমে। পরিচালনা করেন আবদুল জব্বার খান। ছবিতে তিনি নিজেই প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেন। এটাই পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম সবাক বাংলা পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র। সেসময় এখানে কিছু উর্দু চলচ্চিত্রও নির্মাণ হয়েছিল।

বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাসে মুখ ও মুখোশ-এর পরেই আলোচনা হয় একজন ব্যক্তিকে নিয়ে। তিনি জহির রায়হান। ৬০ এর দশক জুড়ে অসাধারণ সব সিনেমা বানালেন জহির রায়হান। তারপর সেই কাঙ্ক্ষিত মুহূর্ত। ১৯৭১ সাল। শুরু হলো স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম, মুক্তির জন্য সংগ্রাম। ১৯৭১ সালে আমরা স্বাধীনতা পেলাম তবে আরো অনেকের মতো জহির রায়হানকে হারালাম। বাংলা চলচ্চিত্র খানিকটা হোঁচট খেল।

পরের দশকে হাল ধরলেন পরিচালক আলমগীর কবির। আন্তর্জাতিক মানের চলচ্চিত্র নির্মাণে পরিচিত হলো বাংলাদেশ। এদিকে এফডিসি কেন্দ্রিক চলচ্চিত্র ধীরে ধীরে দানব আকৃতি ধারণ করতে থাকল। জমে উঠল ফিল্ম ব্যবসা।

আশির দশকে আমজাদ হোসেন, চাষী নজরুল ইসলামের সিনেমা দর্শন জানতে পারল দর্শক। বছরে ৫০ এর অধিক সিনেমা মুক্তি পেতে থাকল। শিল্পী-পরিচালক-কলা-কুশলী-গুজব-ম্যাগাজিন মিলে সে এক জমজমাট অবস্থা।

নব্বই দশক গণতন্ত্রের দশক। মানুষের জীবনে এলো গতি। প্রযুক্তি ও অন্যান্য ক্ষেত্রে দারুণ সব আবিস্কার এলো। মানুষ ব্যস্ত হয়ে গেল আগের থেকে, পরিশ্রমী হয়ে গেল আরো বেশি। প্রয়োজন দেখা দিল মন ভুলানো বিনোদনের, দরকার দেখা দিল আত্ম-পরিচয় অনুসন্ধানের, প্রয়োজন হলো চেতনার। ততদিনে বাংলাদেশের এস্টাবলিশ হয়ে গেছে ব্যান্ড কালচার। আমরা পেলাম কাজী হায়াৎ, শহীদুল ইসলাম খোকন ও তার একটু পরে আন্তর্জাতিক সম্মান এনে দিলেন তারেক মাসুদ।

নব্বইয়ের দশক বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের স্বর্ণযুগ। ১০০-এর কাছাকাছি প্রতি বছর সিনেমা রিলিজ দেওয়ার ইতিহাস রচিত হয়েছিল এই দশকে। স্টার আগে থেকেই ছিল, তবে এই দশকে পাওয়া গেল

বাংলাদেশের সব থেকে বড় সুপারস্টার শালমান শাহ-কে। পুরো দশক জুড়ে চলল চোখ ধাঁধানো সব ছবির মেলা। কোটি কোটি টাকার ব্যবসা হতে থাকল সিনেমাকে কেন্দ্র করে।

তারপর একদিন মারা গেলেন শালমান শাহ। গতি থমকে গেল বাংলা চলচ্চিত্রের। নতুন শতাব্দীতেই প্রবেশ করেই কচ্ছপের মতো উল্টে গেল বাংলাদেশের চলচ্চিত্র। যেন একটা গ্রিক ট্র্যাজেডি। এলো অন্ধকার যুগ— সে যুগ অসামাজিক, গোপন, একান্ত ব্যক্তিগত ও ইচ্ছাকৃতভাবেই তা ছিল অশ্লীল। এবং যার সুতো কাটা হয়েছিল বাংলা চলচ্চিত্রের গোল্ডেন এইজ নব্বই দশকে।

দুই.
নব্বই দশকের মাঝামাঝি ভিসিআর-এ ছেয়ে যায় শহর এবং সিডি-ডিভিডি জনপ্রিয় হতে থাকে। ক্যাবল নেটওয়ার্কের দৌড় বাড়ে, ফলে মানুষ দেশ-বিদেশের চলচ্চিত্র দেখতে শুরু করে। আগে সিনেমা হল ছাড়া সিনেমা দেখার উপায় ছিল না। বিটিভি কয়েকটি ছবি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখাত। মহিলারা মুগ্ধ ও মগ্ন হয়ে টেলিভিশন দেখতেন।

সিনেমা ছাড়াও বিনোদনের অন্য মাধ্যম আসাতে দর্শক অর্ধেক হয়ে যায়। ব্যবসা ধরে রাখার জন্য বেপরোয়া হয়ে ওঠে প্রোডাকশন হাউসগুলো। তারা অশ্লীলতাকে আশ্রয় করে। একটা উদাহরণ মোহাম্মদ হোসেন পরিচালিত রাঙা বউ (আমিন খান, ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, হুমায়ূন ফরীদি)।

সিডি-ডিভিডির আগমনে ব্যবসা কমে যাওয়া শুধু বাংলাদেশের সমস্যা না। প্রায় সারা পৃথিবীতে এই সমস্যা দেখা দিল। তখন আমেরিকায় ডিরেক্ট-টু-ভিডিও নামের একরকমের সিনেমা হলো। যেগুলো ছিল স্বল্প বাজেটের এবং এগুলো সিনেমা হলে বা স্যাটেলাইটে দেখানো হতো না। এগুলো সরাসরি সিডি-ডিভিডিতে রিলিজ করত। সেই মুভিগুলোর ফর্মুলা নিয়ে মূলত অশ্লীল যুগের প্রতিটা সিনেমা ডিজাইন করা হতো। আমেরিকা, গোটা ইউরোপ, চায়না, জাপান, হংকং, ইন্ডিয়া, বাংলাদেশ এরকম সিনেমাই হতো। তবে তারা দর্শকদের হলে ধরে রাখার কৌশল আবিস্কার করতে পারলেও আমরা পারিনি। পরবর্তীতে প্রতিটা ইন্ডাস্ট্রি ঐ অবস্থান থেকে ঘুরে দাঁড়িয়েছে এবং আমরাও।

তিন.
২০০০ সালের পর থেকেই অশ্লীলতার স্বর্ণযুগ শুরু হলো। সেসময় প্রতিবছর ৮০-র বেশি চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে। সুশীল সমাজ ও নাগরিকরা টেলিভিশনমুখী হয়ে গেলেন এবং বিদেশি চলচ্চিত্রে বেশি আকৃষ্ট হলেন। বাংলা ছবির দর্শক থাকল মূলত গ্রাম আর মফস্বলে। সাধারণত অশিক্ষিত তরুণরা এবং যুবকরা। এরই মধ্যে নায়িকা মুনমুন ও ময়ূরীর পরিচিতি বেড়েছে।

জনপ্রিয় চলচ্চিত্র ম্যাডাম ফুলি-খ্যাত নায়ক আলেকজেন্ডার বো খানিকটা নাম পরিবর্তন করে লিডে চলে আসলেন।

মান্না তো আগে থেকেই ছিলেন। রুবেলের উপস্থিতিও ছিল দেখার মতো। রিয়াজ-ফেরদৌসের উপস্থিতি খানিকটা কমে গেল। তবে হঠাৎ হঠাৎ দেখাও যেত। অমিত হাসান প্রধান সারিতে ঢুকে গেলেন। নায়িকাদের মধ্যে আসলেন পলি, মনিকা। এরা মূলত গল্পের ব্যাকআপ হিসেবে থাকতেন। ওদিকে ছবির যাবতীয় অশ্লীল কাজ-কারবার করত সাইড নায়ক-নায়িকারা। ডন, মেহেদি, সোহেল, আসিফ ইকবাল, আবরাজ খান, শিখা, ঝর্ণা, শাপলা, শায়লা ও নাম জানা-অজানা অনেকে।

নব্বই দশকের নায়করা অশ্লীল যুগে উপস্থিত থাকলেও নায়িকাদের উপস্থিতি অনেক কমে যায়। পুর্ণিমা ও শাবনূর মান্নার সাথে কিছু ছবি করেন এবং ছবিগুলো বেশ সংযত ছিল। রুবেল ও মান্নার সাথে জুটি বেঁধে কিছু ছবিতে অভিনয় করেন পপি। নব্বই দশকের নিয়মিত ও পরিচিত মুখ নাসরিন ছিল অশ্লীল যুগের কি-রোলে। প্রায় সকল মুভিতেই তার উপস্থিতি থাকত এবং অশ্লীল দৃশ্যেও সে ছিল পেশাদার। শুরুর দিকে শাকিব খান সাইড রোলে থাকতেন। মান্না ও আলেকজেন্ডারের নিচে। পরে সেখান থেকে শাকিবকে কেন্দ্র করেই কিছু সিনেমা হয়। আর শাকিব অভিনীত এই সিনেমাগুলো ছিল অশ্লীল যুগের মূলধারা থেকে কিছুটা ভিন্ন।

চার.
অশ্লীল যুগে নানা রকমের সিনেমা হয়েছে। ১৯৯৭ সাল থেকে ২০০৩ পর্যন্ত পুরোদমে এবং তারপর থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত বিরতি দিয়ে চলল। ছবি মুক্তির পরিমাণ কমে গেল। অশ্লীল যুগের এই তপ্ত হাওয়া থেকে বছরে সর্বোচ্চ ১০টা ছবি গা বাচাতে পেরেছে। বাকি প্রায় সব ছবিই এই জ্বরে আক্রান্ত। ১৯৯৭-২০০৭ পর্যন্ত কমপক্ষে ৫০০ চলচ্চিত্র হয়েছে। সব প্রডাকশনই এ ধরনের কম-বেশি সিনেমা নির্মাণ করেছে। তবে বিতরণের দিক থেকে লাভা ভিডিও ছিল উল্লেখযোগ্য। লাভা ভিডিও মুলত অশ্লীল যুগকে দিক নির্দেশনা দিয়েছে।

এ যুগের অধিকাংশ ছবিই মানের দিক থেকে খুবই নিম্ন। প্রায় প্রতিটারই গল্প একই রকম। তবে এর ভেতরেও বেশ কিছু চমৎকার ছবি হয়েছে। সেগুলোকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করার দরকার নেই, তবে অস্বীকার করারও উপায় নাই।

অশ্লীল যুগটাকে চার ধাপে বিভক্ত করা যায়— প্রথম ধাপে নায়িকাদের তুলনামুলক ছোট জামা পরানো হতো। দ্বিতীয় ধাপে সাদা জামা পরে বৃষ্টিতে ভেজা, গোসলের দৃশ্য, পোশাক পরিবর্তনের দৃশ্য ইত্যাদি। তৃতীয় ধাপে বিদেশি পর্নগ্রাফির কাটপিস। এবং সবার শেষ ধাপে দেশীয় নায়িকারাই এসব দৃশ্য করেছেন।

অশ্লীল যুগের ট্রেডমার্ক অর্থাৎ চতুর্থ ধাপের ছবিগুলো হলো দুর্ধর্ষ সামসু, নষ্টা মেয়ে, জাদরেল, জাল, জাতশত্রু। এগুলোতে কোন কাটপিস নেই। সরাসরি অভিনেত্রীরাই যৌন দৃশ্যে অভিনয় করেন। একেবারে পর্নগ্রাফির ধরনে দেশি নায়িকাদের রগরগে যৌন দৃশ্য বেশ সময় নিয়ে দেখানো হয়। ওই দশ বছর এই পাঁচ ছবি আলোচনায় থেকেছে। মানুষের মুখে মুখে বিজ্ঞাপনে প্রচুর ব্যবসাও করেছে।

পাঁচ.
বাংলাদেশের ছবিতে অশ্লীলতার ইতিহাস কিন্তু আরো কিছুটা পুরনো। ১৯৯৭ সাল থেকে জুড়ে বসলেও এর অনেক আগে থেকেই এই চর্চা লক্ষ্য করা যায়। সামাজিক ছবি আমাদের দেশে জনপ্রিয় ছিল বেশি। এবং শুরু থেকেই আমাদের দেশে চলচ্চিত্রে প্রতিযোগিতাও ছিল শক্তিশালী। তো, অনেকেই চেয়েছেন প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে। তারা অশ্লীলতা আমদানি করেছেন। এবং যৌনতাকে দেখাবার জন্য বারবার ভারতের দিকে হাত বাড়ানো হয়েছে, সেখান থেকে আর্টিস্ট এনে এক্সপেরিমেন্ট চালানো হয়েছে।

পরিচালক এফ কবির অঞ্জু ঘোষকে নিয়ে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশের দর্শকদের খোলামেলা দৃশ্যের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন। বৃষ্টিতে ভিজে গান। পরে আবুল খায়ের বুলবুল নব্বই দশক জুড়ে ছবিতে বিভিন্ন সময়ে গোসলের দৃশ্য দেখিয়েছে। স্বল্প বাজেটের এসব সিনেমাতে যৌনতা থাকার কারণে ব্যবসায়িক লাভও এসেছে।

মোহাম্মাদ হোসেন অবুঝ দুটি মন ছবিতে চর্চাটা চালিয়ে গেলেন। এই সিনেমায় প্রথম বাংলাদেশের কোন নায়িকাকে সুইমিং পুলে গোসলের দৃশ্য দেখানো হল। নায়িকা ছিলেন মডেল রথি (গুরু জেমসের প্রথম স্ত্রী)। আবুল খায়েল বুলবুলের অন্যায়-অত্যাচার ছবিতে পাহাড়ি ঝর্ণায় গোসলের দৃশ্য দেখা গেল। মোহাম্মদ হোসেন পরে বানালেন রাঙা বউ। এবার নায়িকা কলকাতার ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তা। এ ছবি আলোড়ন তুলল তরুণ সমাজে।

সিডির মাধ্যমে বহুল প্রচারিত এ সময়কার সিনেমা হল এনায়েত করিমের জননেতা, কদম আলী মাস্তান, ক্ষুধার জ্বালা, ইস্পাহানি আরিফ জাহানের গোলাম, বাদশা ভাইয়ের ভয়াবহ।
জননেতা ছবিতে প্রথমবার বাংলাদেশে সরাসরি উন্মুক্ত বক্ষ প্রদর্শন করা হল। কদম আলী মাস্তানও অশ্লীলতার দিক দিয়ে স্মার্ট। ভয়াবহ ছবিতে বি-গ্রেডের নায়িকার আমদানি ঘটল। শরিফুদ্দিন খান দিপু বানিয়েছিলেন বাঁচাও দেশ, পুলিশ অফিসার।

অশ্লীল যুগের সিনেমা বানাতেন মূলত এনায়েত করিম, মোহাম্মদ হোসেন (ফায়ার), শরিফুদ্দিন খান দিপু, স্বপন চৌধুরী, শাহাদাৎ হোসেন লিটন (কঠিন শাস্তি) এবং তার বড় ভাই বাদশা ভাই (লণ্ডভণ্ড, জোগি ঠাকুর), বদিউল আলম খোকন (দানব), রাজু চৌধুরী, এম এ আউয়াল, পল্লী মালেক (ঢাকার কুতুব), এম বি মানিক (জাদরেল), শাহিন-সুমন (নষ্ট), মালেক আফসারী (মরণ কামড়, মৃত্যুর মুখে), মোস্তাফিজুর রহমান বাবু (স্পর্ধা), উত্তম আকাশ আরো অনেকে।

এ ধরনের আরো সিনেমা— ভণ্ড ওঝা, লালু কসাই, নানা ভাই, রানী কেন ডাকাত, দানব সন্তান, মহিলা হোস্টেল, নষ্টা মেয়ে, মডেল গার্ল, রুখে দাঁড়াও, নিষিদ্ধ নারী, নাজেহাল, রক্তচোষা, ক্ষমতা, বস্তির রানী সুরিয়া, আজকের আক্রমণ, পাগলা হাওয়া, আজকের চাঁদাবাজ, ওরা কারা, রিভেঞ্জ, চরম শিক্ষা, বুলেট প্রুফ, বাংলার সৈনিক, নরক, ডেঞ্জার সেভেন, নাইট ক্লাব, বুকের পাটা, নিষিদ্ধ পল্লী, নয়া কসাই, ধমক, ওরা অগ্নি কন্যা, চশমখোর, মুখোশধারী, দুধর্ষ দুর্জয়, রক্ষা নাই, অন্ধকারের চিতা, হঠাও দুর্নীতি, শীর্ষ সন্ত্রাসী গ্রেফতার, লাল চোখ, নিষিদ্ধ যাত্রা, ডেয়ারিং, সন্ত্রাসী ধরো, বিষাক্ত ছোবল, জলন্ত বিস্ফোরণ, ঠ্যাকাবাজ, দুই নাম্বার, দুই মাস্তান, জাদরেল শয়তান ইত্যাদি।

ছয়.
এসব ছবি নির্মিত হয়েছে এফডিসিতে। কাকরাইলে প্রস্তুত হয়ে, সেন্সর বোর্ড ফাঁকি দিয়ে সারাদেশে ছড়িয়ে গেছে। এই লেখার শুরুতে বলা হয়েছে, এ এক অন্ধকার যুগ, গোপন ও ব্যক্তিগত। কারণ এফডিসিতে তখন ব্যাপক অরাজকতা চলছে। নব্বই দশকে যাদের হাতে ক্ষমতা ছিল তা হাতছাড়া হয়ে গেছে। আমজাদ হোসেন, এ জে মিন্টু, শহীদুল ইসলাম খোকনের মতো পরিচালকেরা চাপে পড়ে গেছেন। সিনেমা বানানো বন্ধ করে দিয়েছেন। তৈরি হয়েছে এক বিশাল সিন্ডিকেট। সরকার থেকে শুরু করে গ্রামের হল পর্যন্ত যার বিস্তার। সারাদিন এফডিসিতে অখণ্ড নীরবতা, সন্ধ্যার পরেই আলো জ্বলে উঠেছে সবখানে। শুরু হয়ে গেছে তুমুল ব্যস্ততা। ফ্লোরে ফ্লোরে চলছে শুটিং। মদ-গাঁজা-হেরোইনের গন্ধে মাতাল এফডিসি। সিনেমার কাজে নিরাপত্তা দরকার হয়। ভালো কাজে পুলিশ নিরাপত্তা দেয়, খারাপ কাজে দেয় মাস্তানেরা। এফডিসিতে এসব সত্যিকারের মাস্তান কোণা-কিনারে ঘাপটি মেরে বসে থাকে।

এ সময় নতুন একঝাঁক নারী দিয়ে ভরে যায় এফডিসি। সংখ্যার তারা প্রচুর, চলছে তাদের স্বপ্ন দেখানো, চলছে নষ্টামি। চারিদিকে টাকা ও যৌনতার ছড়াছড়ি। বেশ একটা ফুর্তি ফুর্তি ভাব। সবার মধ্যেই উল্লাস। যখন তখন জামা-কাপড় খুলতে হচ্ছে, জামা-কাপড় না খুললে সেই ছবি লোকে দেখে না।

তবে সবসময় যে স্বেচ্ছায় নায়িকারা এসব কাজ করেছে তা কিন্তু না। নতুন নায়িকাদের সাথে চুক্তি করা হয়েছে, পরে জামা খোলার কথা বলা হয়েছে। তারা রাজি হয়নি অনেক সময়— তখন চুক্তির আইনি ভয় দেখানো হয়েছে, জোর করা হয়েছে, ভয়ভীতি দেখানো হয়েছে। মাস্তানদের গান পয়েন্টেও অনেক নায়িকারা এসব দৃশ্যে অভিনয় করেছেন।

অনেকসময় মাদকাসক্ত করে অভিনয় করানো হয়েছে। অনেক ছবির দৃশ্য লক্ষ্য করলেই এই অচেতন অবস্থা ধরা পরে। অনেক সময় নায়িকার মুখ না দেখিয়ে শুধু বিবস্ত্র শরীর দেখানো হয়েছে, নারী নিশ্চিতভাবে অচেতন এবং পুরুষের হাত ঘুরে বেড়াচ্ছে তার শরীরে। অধিকাংশ নায়িকাকে ব্ল্যাকমেইল করা হয়েছে— যতটুকু সে করতে চায় তার থেকে বেশি করার জন্য ধারাবাহিক চাপ দেওয়া হয়েছে।

ছবির জন্য যারা ঘর ছেড়েছে, সামাজিক অবস্থান নষ্ট করেছে, মানুষের প্রাচীন তবে গোপন চাহিদা পূরণ করেছে— এই তাদেরকেই চলচ্চিত্র একসময় অস্বীকার করেছে। তাদের দিকে আঙ্গুল তুলেছে, নিষিদ্ধ করেছে। অথচ ঘৃণাটা পাওয়া উচিত সিন্ডিকেটের। সিন্ডিকেটের কাছে দর্শক যেমন অসহায় ছিল তেমন ছিল সমাজ, তেমন ছিল রাষ্ট্র, তেমন ছিল হল, তেমন ছিল সিনিয়র আর্টিস্টরা, একই রকম অসহায় ছিল নায়িকারাও। তাদের কারোই খোঁজ এখন আমরা জানি না।

যাইহোক, এফডিসির অবস্থা তখন এরকমই। সিনেমার মতোই। কাল্পনিক আসলে কিছুই হয়না তারমধ্যে একটু না একটু বাস্তব ঢুকে যায়। নগ্ন হামলা অনেকেরই খুব পছন্দের একটি ছবি। এখানে নায়িকা নদীর চরিত্রটি দেখলে এফডিসির তখনকার স্বভাব খানিকটা বোঝা যাবে। বোঝা যাবে নীতিবানদের ফ্যান্টাসি তখন কী ছিল।

সাত.
শ্রেনী বিভাগের গল্পই মূলত অশ্লীল যুগের গল্প। তাছাড়া প্রতিশোধ পরায়ণতাকে গল্পের মূল উপজীব্য করা হয়েছে। যৌনতা দেখানোর প্রধান বাহন ছিল ধর্ষণ। এমন একটা সিনেমা পাওয়া যাবে না যেখানে ধর্ষণ নেই, নারী এসেছে পণ্য হিসেবে।

অ্যাকশন ছিল মাত্রারিক্ত, ভায়োলেন্স বা সহিংসতা ছিল আগের যেকোন সময়ের থেকে বেশি। সংলাপ ছিল অসংযত। যখন তখন গালাগাল ও অশ্লীল কথাবার্তা।

ড্রামা থাকতো খুবই কম, মারমার কাটকাট অ্যাকশন এবং গানে গানে সিনেমা শেষ হয়ে যেত। তবে এই পরিস্থিতির মধ্যে থেকেও বেশ কিছু মধ্যম মানের সিনেমা নির্মিত হয়েছে। যেমন মান্নার আমার মা, শাকিব-মান্নার সিটি টেরর, রুবেলের সদর ঘাটের কুলি ও শাকিবের খুনী শিকদার।

ততদিনে মধ্যবিত্ত মুভি দেখা বন্ধ করে দিয়েছে এবং দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাওয়ার মতো আবেগে টেলিভিশনে দেশ-বিদেশের গল্প দেখছে, বিশেষ করে হলিউড-বলিউড। কিন্তু দুঃখজনক হলিউড-বলিউডের মানের সাথে পাল্লা দেবার চেষ্টা এদেশে করা হয়নি, বরং ইন্ডাট্রি টিকিয়ে রাখার জন্য গ্রহণ করা হয়েছে ‘পুওর টেকনিক’।

মূলত তখন ছবি বানানো হতো একটা ছোট অংশের দর্শকের উপরে নির্ভর করে। তাদের মন রাখার জন্য প্রায় সবকিছু করা হয়েছে। হয়তো ভেতরে ভেতরে সবাই এটা নিয়ে অস্বস্তিতে ছিল।

ভালো ভালো জনপ্রিয় পরিচালকও বৈপ্লবিক কিছু না করে ‘পুওর টেকনিক’-এর দিকে হেঁটেছেন। চলতি হাওয়ায় গা ভাসিয়েছেন। তাছাড়া অনেক কিছু থেকে বিরত থেকেছেন, সংযত রেখেছেন নিজেকে কিন্তু তাতেও তারা অশ্লীল সিনেমা থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলেন না।

একসময়ে মধ্যবিত্ত ও নাগরিকদের ধ্যান ভাঙল। টেলিভিশন থেকে মুখ ফিরিয়ে তারা ইন্ডাস্ট্রির দিকে তাকালেন, হতাশ হলেন। বিষয়টা নিয়ে তারা ভাবা শুরু করলেন, পত্র-পত্রিকা সজাগ হলো। জনমত তৈরি হলো, আলোচনার জানলা খুলে গেল ও বাংলা সিনেমা নিয়ে চারিদিকে ছি ছি পড়ে গেল।

আট.
বাংলা চলচ্চিত্রের ভয়ংকর অশ্লীলতার যুগ ২০০৬ সালে এসে কিছুটা দুর্বল হয়ে যায়। ফখরুদ্দীন আহমেদের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে এর প্রকোপ কিছুটা স্তিমিত হল। র‍্যা ব হানা দিল কাকরাইলের অফিসগুলোতে। জব্দ করল হাজার হাজার কাটপিস, অগণিত নীল ছবি, অসংখ্য অশ্লীল পোস্টার।

২০০৭ এর শুরু দিকে এফডিসি এবং ইন্ডাস্ট্রির বিভিন্ন অঙ্গনে শুরু হল প্রতিরোধ। শুরু হল অশ্লীলতাবিরোধী আন্দোলন। আন্দোলনের পুরোধা ছিলেন নায়ক মান্না। সাথে যোগ দিলেন কিছু শুভাকাঙ্ক্ষী। থাকলেন পরিচালক মালেক আফসারী ও ভিলেন ডিপজল। যদিও এরা সবাই অশ্লীল যুগে সক্রিয় ছিলেন। আন্দোলনকে সমর্থন দিল গণমাধ্যম।

অশ্লীলতাবিরোধী আন্দোলন কথাটা শুনলে কিছুটা খটকা লাগে। মনে হয় চলচ্চিত্রে তো অশ্লীলতা থাকতেই পারে। অশ্লীলতা ব্যবহার করার স্বাধীনতা সিনেমা শিল্পের তো থাকা উচিত। আর তাছাড়া সবক্ষেত্রেই নগ্নতা কিন্তু অশ্লীলতা নয়। কখনো নগ্নতা সমাজবাস্তবকেও তুলে ধরতে পারে।

কিন্তু ঐসময়ের চলচ্চিত্রকে নামে বলা হচ্ছে অশ্লীল বাস্তবে এগুলো ছিল অশ্লীলতার থেকেও বেশি কিছু। তখনকার সিনেমাগুলো আলোচিত কারণ চলচ্চিত্রের ভিতরে ঢুকিয়ে দেয়া হতো কাটপিস। যা ছিল মূলত বিদেশি পর্নগ্রাফি ছবির কয়েক মিনিটের একটা কাটপিস। মুক্তি পাওয়া প্রায় প্রত্যেকটা চলচ্চিত্রে এই কাটপিস থাকত। প্রথমদিকে হল মালিকেরা এই কাটপিস ঢুকাতো, পরবর্তীতে প্রডাকশন থেকেই কাটপিস হয়ে বেরুতো। আরো পরে পরিচালকরা নিজেরাই কাটপিস ঢোকাতেন এবং শেষের দিকে নিজেরাই বানাতেন।

‘কাটপিস হলো মূল প্রিন্টের সঙ্গে উপস্থাপিত নয় এরকম কোনো ফুটেজ। কিন্তু পরিবর্তিত অর্থে, কাহিনীর সঙ্গে একেবারে সম্পর্কহীন জুড়ে দেওয়া পর্নগ্রাফিক রিলকেই আমরা কাটপিস বুঝে থাকি। এটি ছবির যেকোনো পর্যায়ে দেখানো হতে পারে, সাধারণত মাঝামাঝি, বিরতির আগে বা পরে এটি দেখানো হয়ে থাকে। সাধারণত এটি একটি গানের দৃশ্য হয়ে থাকে, তবে স্নানের দৃশ্যও হতে পারে; এমনকি সঙ্গমের দৃশ্যও হতে পারে।’— এমনটা বলেন শিক্ষক ও গবেষক ফাহমিদুল হক।

অশ্লীলতাবিরোধী আন্দোলন মূলত কাটপিসের বিরুদ্ধে আন্দোলন। তাই বর্তমানের আইটেম সং এর সাথে অশ্লীল যুগের তুলনা দেওয়ার কোন প্রশ্নই আসে না।

অশ্লীল যুগের সিনেমা নিয়ে অনেকের কখনোই কোন সমস্যা ছিল না। সেইসময়ের লো-বাজেটের সিনেমাগুলোর আলাদা একটা ফরমেশন ছিল। মূল সিনেমাগুলো অ্যাকশন-থ্রিলার জনরার হতো। আমেরিকার এইটিজের রেট্রোর একটা আবহ ছিল। ভায়োলেন্স ছিল প্রচুর। এবং কিছু কিছু কাহিনী ছিল দেশের তুলনায় খুবই ডার্ক এবং তা অবশ্যই এবং অবশ্যই সমাজবাস্তবতাকে প্রতিফলিত করেছে। তেমন একটা সিনেমা নগ্ন হামলা। আরো একটা সিনেমা জেল থেকে বলছি।

ওই যুগের অবসানের পর বাংলাদেশের ডিস্ট্রিবিউটররা ইউটিউবে চলে আসছে। এ কারণে আমরা অশ্লীল যুগের প্রায় সব সিনেমাই কাটপিস ছাড়া দেখতে পারছি।

যাইহোক, অশ্লীল সিনেমার বিরুদ্ধে আন্দোলন ও সমালোচনা হয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় ময়ূরী, মুনমুন, পলিসহ বেশ কয়েকজন অশ্লীল নৃত্যের নায়িকাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। নিষিদ্ধের কেউ কেউ এখন সিদ্ধ হয়েছেন, হয়তো আগামীতে প্রসিদ্ধ হবেন। তবে এ কথা নিশ্চয় অনেকেই স্বীকার করবেন— নিষিদ্ধ ভালো কিছু নয়।

২০০৭ সালের পর শাকিব-শাবনূর অভিনীত জন্ম দিয়ে হাওয়া খানিকটা বদল হয়। তারপরে ডিপজল এসে শাকিবকে নিয়ে কিছু সিনেমা নির্মাণ করেন যার কারণে ইন্ডাস্ট্রি অশ্লীল যুগ থেকে একরকমের মুক্তি পায়।

এখন ২০১৭ সাল চলছে। এতদিন পরে এসে দেখা যায় চরমভাবে অশ্লীল যুগকে এড়িয়ে যাওয়া হয়। যেন ঐ দশ বছরে কোন ভালো ছবি হয়নি। যেন ঐ দশ বছর বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসের নিষিদ্ধ বছর। এটা আসলে সংকীর্ণ মানসিকতা। ঐ সময়েও ভালো ভালো কিছু ছবি হয়েছে। যেগুলোতে অশ্লীলতা বিজ্ঞাপন হিসেবে এসেছে কিন্তু ছবির মানকে তা ক্ষতি করেনি। এরকম কিছু ছবি এখনো অনেকে দেখে, এড়িয়ে যায় না। আর যদি কেউ এড়িয়েও যায়, এসব ছবিকে অস্বীকার করা যাবে কি?

জুবায়েদ দ্বীপ: ফিল্মবাফ এবং ব্লগার

ফায়ারফ্লাইজ মানেই কি অসফল পরিণতি?

আল মাহফুজ

'পৃথিবীতে এমন অনেক মহান পেশা বা নেশা আছে— যা করতে ক্রিয়েটিভিটির প্রয়োজন পড়ে।
এই সংলাপের সাথে একমত না দ্বিমত— সম্পূর্ণ আপনার ব্যাপার। তবে একটা বিষয়ে মোটামুটি সবাই কমবেশি একমত হবেন যে, বাংলাদেশের নির্মাণের মান এখন অনেকটাই এগিয়েছে অথবা 'মানসম্মত' করার আন্তরিক প্রচেষ্টা আছে।

টেলিভিশনে যেসব ফিল্ম (টিভিমুভি/টেলিফিল্ম) দেখানো হয়, সম্ভবত সময় স্বল্পতা অথবা বিজ্ঞাপন জ্বালাতনে আমাদের অনেকেরই দেখা হয়ে ওঠে না। সেখান থেকে তুলনামূলক ভালো কাজগুলো আমরা 'ইউটিউব' নামক এক আশ্চর্য বাকসো থেকে অনায়াসে বিরতিহীন দেখতে পারি। আহা! কতই না সহজ আমাদের মুভি যাপন!

বিশ্বের নানা প্রান্তে বিভিন্ন উৎসবে বাংলাদেশের চমৎকার ও দুর্দান্ত সব সিনেমার প্রদর্শনী হয়।প্রশংসিতও হয় কিছু কিছু। এমনকি মাঝেমধ্যে পুরস্কারও ছিনিয়ে নিয়ে আসে।
অর্থের অভাবে অথবা অন্য কোন কারণে যখন একটা ফিল্ম সিনেমা হলের উপযোগী করে বানানো যায় না কিংবা গুটিকয়েক সিনেমা হল ছাড়া সারাদেশের সিনেমাহলগুলোতে মুক্তি দেওয়া সম্ভব হয় না, সেটা আমাদের চলচ্চিত্র শিল্পের দীনতা বোঝাতেই যথেষ্ট। এই আলাপ গুরুজন-অভিজ্ঞজনেরা আরো বিশদভাবে করতে পারবেন। আমি আলাপ করি সম্প্রতি দেখা এমন একটা ফিল্মের কথা— যেটা টিভিতে প্রদর্শনের ফলে আমরা টিভিমুভি/টেলিফিল্ম বলেছি।

অমিত সম্ভাবনা নিয়ে যে ফিল্মটির যাত্রা শুরু হয়েছিল, তার নাম ফায়ারফ্লাইজ। লেখার শুরুর সংলাপটি ওই ছবির। প্রায় সবাই অভিনয়ে নতুন মুখ ও কম পরিচিত। গল্পটাও প্রচলিত। একজন শিক্ষিত বেকারের 'সিরিয়াল কিলার' বনে যাওয়া এবং সেখান থেকে উতরানোর নিরীহ চেষ্টা।
গল্পের গাঁথুনি ও চিত্রনাট্যে সম্পূর্ণতার অভাব। সেখানে ভুল-ত্রুটির অভাব থাকলেই বরং একজন দর্শকের প্রাণের তেষ্টা মেটে। সময়টা দারুণ কেটেছে বলে মনে হয়।

ফায়ারফ্লাইজ-এর ক্যামেরার কাজ কারো কারো কাছে বিরক্তিকর ঠেকলেও আমার কাছে ভালো লেগেছে। নতুনত্ব পেয়েছি। অধিকাংশ দৃশ্য হ্যান্ডহেল্ড ক্যামেরায় ধারণকৃত। আধো কাঁপা কাঁপা অথবা অস্থির মুহূর্ত। সেটা ফিল্মটির টেম্পোর সাথে প্রাসঙ্গিক। কিছু কিছু শট দেখে আমি ভীষণ মুগ্ধ হয়েছি। যেমন; মিথ্যে আশ্বাসবাণী ও গাড়ির চাকায় পিষ্ট ফটোগ্রাফের পীড়নে যখন ভুগছে বেকার যুবক, 'গোয়েন্দা' ক্যামেরা তখন লোহার গেটের বাইরে। অথবা খানিকটা লো এঙ্গেল থেকে দেখানো পিপাসার্ত যুবকের পানি পান, যেখানে দুটো পানির কলের একটি থেকে টপটপ করে অবিরত জলের ফোঁটার নির্গমন... যেন সেটা যুবকের একাকীত্ব ও চাপাকান্নাকে প্রশ্নবিদ্ধ করছে।

রিহান আর পরিচালিত ও ২০১৪ সালে এনটিভিতে প্রদর্শিত দেড় ঘণ্টা ব্যাপ্তির (বর্তমানে ইউটিউবে যেটি আপলোডেড, সেটার ব্যাপ্তি কম) ফিল্মটিতে শূন্য ব্যান্ডের একটি শ্রুতিমধুর গান আছে। ফুয়াদেরও একটি গান আছে। গল্প ও আবহ সংগীতে থ্রিল আছে, মোচড় দেওয়া সমাপ্তিও আছে।

তবে আর বসে কেন,বস? কথা দিলাম, দেখে ঠকবেন না।

আল মাহফুজ, চলচ্চিত্র লেখক

ফিল্মস্কুলের অভিজ্ঞতা

বিদ্রোহী দীপন

প্রায় এক বছর মুম্বাইয়ে সিনেমাটোগ্রাফি নিয়ে পড়া শেষ করে মাস দুয়েক হলো দেশে ফিরেছি। দেশে ফিরে একটি প্রশ্ন আমাকে অনেক শুনতে হয়েছে, এখনো শুনছি। প্রশ্নটি হলো— কেমন গেল এক বছর? সবার কাছে আমার উত্তর ছিল একই রকম, 'it was an effective and quality year of my life.' কথাটি শুধু বলার জন্যেই বলা নয়, এটা আমি মুম্বাইয়ে পড়ার সময় প্রতিটা মুহূর্তে অনুভব করেছি।

তো, এখন আসি ফিল্ম নিয়ে পড়াশোনা প্রসঙ্গে। আমি মনে করি সিনেমাটা একটা আলাদা ভাষা। এই ভাষাকে বুঝতে, জানতে হলে এর বর্ণ, শব্দ আপনাকে জানতেই হবে। সেটা কীভাবে আপনি জানবেন বা শিখবেন সেটা সম্পূর্ণ আপনার ব্যাপার। এবং আপনার জানাটা সঠিকভাবে হচ্ছে কিনা সেটাও একটা উল্লেখ্য, আমি ফিল্ম স্কুলে যাওয়ার অনেক আগে থেকেই সিনেমাটোগ্রাফি চর্চা করে আসছি। ২০১১ থেকে নিজেকে গড়ে তোলার কাজ শুরু করি, ২০১৫ পর্যন্ত নেটে পড়াশোনা, বিভিন্ন ওয়ার্কশপ, সিনিয়র সিনেমাটোগ্রাফারদের অ্যাসিস্ট করা থেকে শুরু করে ক্যামেরা ক্রু হিসেবে এবং স্বাধীনভাবে কিছু কাজের মাধ্যমে। এরপর ২০১৬ সালে ফিল্ম স্কুলে পড়তে যাই।

প্রাকটিক্যাল অর্থে এই কাজ করার অভিজ্ঞতা ফিল্ম স্কুলে আমাকে দারুণভাবে সাহায্য করেছে। কীভাবে সাহায্য করেছে সেটা আমি একটু শেয়ার করতে চাই। ফিল্ম স্কুলে আপনাকে অনেক বিষয় সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া হবে, এত বেশি কিছু থাকে যে পুরো ব্যাপারটা মাঝে-মধ্যে খুবই জটিল মনে হয়। যারা একদমই নতুন তারা অনেক সময়ই বুঝে উঠতে পারে না, এবং অনেক সময় অন্যান্য পড়াশোনার মতো ফিল্ম স্টাডিটাও গুলিয়ে ফেলে।

আমার উপলব্ধিও এমন— যদি আমি একদমই নতুন অবস্থায় ফিল্ম স্কুলে আসতাম তাহলে হয়তো বা এই পেশায় আমার থাকা হতো কিনা সন্দেহ! কিন্তু প্রাকটিক্যাল কাজের অভিজ্ঞতার কারণে আমি নিজেকে কন্ট্রোল করতে পেরেছিলাম দারুণভাবে। কতটুকু আমাকে গভীরভাবে নিতে হবে, আর কতটুকু হালকাভাবে তা প্রাকটিক্যাল কাজের অভিজ্ঞতাই বুঝিয়ে দিতে সাহায্য করেছে। তবে এই ফিল্টারাইজেশনের ব্যাপারে দিন শেষে আমি কী করতে চাই সেটার ব্যাপারে ফোকাসড থাকারও একটা ফ্যাক্ট কাজ করে। তবে এই কিছুটা কাজের অভিজ্ঞতা আমাকে প্রথমদিকে সামান্য হলেও সমস্যায় ফেলে দিয়েছিল।

প্রথমদিককার ক্লাসগুলোতে ভাবতে শুরু করেছিলাম এসব তো আমি জানিই, অ্যাডভান্স ক্লাসগুলোর অপেক্ষা করতাম। এরপর আমি নিজেকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলাম ক্লাসের নির্দেশিত পথেই আমাকে আগাতে হবে, তারপরই প্রতিদিন জানা ব্যাপারগুলো থেকেই ভুল শুধরাতে শুরু করি।

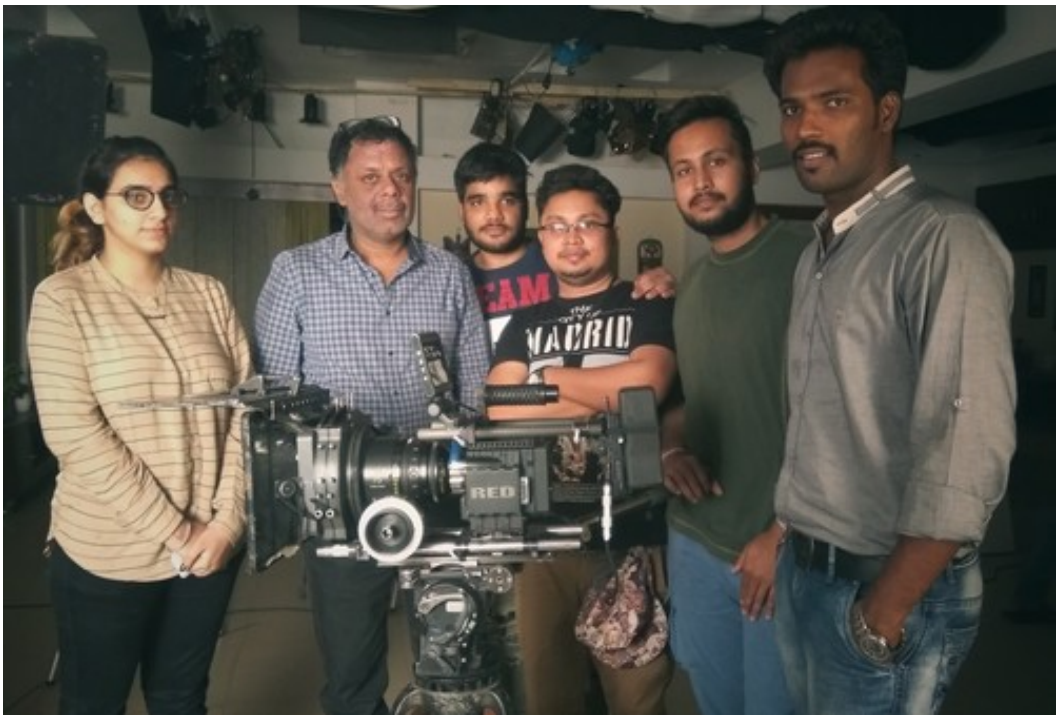

সেটা দিন শেষে ঐ বিষয় সম্পর্কে জানা-শোনা আরো পোক্ত হতে শুরু করে। এবং ফিল্ম স্কুল শেষে আমার অনুভূতিটা ছিল এমন— 'আহা এতদিন অন্ধ ছিলাম, একটু আলো পেয়েছি, এখন মরেও যে শান্তি পাবো... হা হা হা !'

এই বোধটা এসেছে প্রত্যেকটা দিনই নতুন কিছু শেখার পাশাপাশি নিজের ভুলে ভরা জানার জগতকে শুধরানোর প্রাকটিস থেকে। এর পেছনে সবচেয়ে বড় অবদান ছিল আমাদের দারুণ অভিজ্ঞ সব শিক্ষকদের। তাঁরা প্রাকটিক্যালি শেখানোর পাশাপাশি, তাঁদের জীবনকে দেখার নিজস্ব স্টাইলটাও আমাদের সাথে শেয়ার করতেন এবং বারবার বলতেন, 'তোমাকে কিন্তু তোমার মতো করেই জীবনকে দেখতে হবে, শিখতে হবে।' আর এই ব্যাপারটাই আমার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে। জীবনকে যদি আপনি দেখতেই না শিখলেন বা পারলেন তাহলে কিসের সিনেমাটোগ্রাফি আর কিসের ফিল্ম মেকিং।

সবশেষে আমি বলব, ফিল্ম স্কুল শুধু আপনাকে বর্ণ পরিচয় পর্যন্ত দেখিয়ে দেবে, বুঝিয়ে দেবে এবং সাথে আপনার অ্যাপ্রোচটা ডেভেলপ করে দেবে। সেই জ্ঞান নিয়ে বর্ণ থেকে শব্দ, কিংবা শব্দ দিয়ে বাক্য গঠনের কাজে মুন্সিয়ানা আনতে হবে আপনার নিজের কাজের মাধ্যমেই। সাথে সাথে প্রচুর পড়তে হবে, ব্যাপারটা এমন না যে শুধু ফিল্ম নিয়েই পড়বেন। সব পড়তে হবে— রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি, ভূগোল, ইতিহাস সব। আর এই পড়ার কোনো বিকল্প নেই। বর্তমান সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে এই একটি দিকেই আমরা খুবই দূর্বল— পড়ি না বা পড়তে চাই না, যেটা খুবই দুঃখজনক।

আর হ্যা, অবশ্যই পাশাপাশি প্রচুর ফিল্ম দেখতে হবে, প্রতিদিন অন্তত একটি ফিল্ম দেখার অভ্যাস থাকা খুবই ভালো।

লেখক: চিত্রগ্রাহক